Be familiar with www.banglatorrents.com

অলংকরণ: অনীশ রায়

উপন্যাস

# এই অফুরান

## উৎপলকুমার দত্ত

বনের পাখি, খাঁচার পাখি

তিনি আসেন রোজ। বিন্ধ্য পর্বতের ওপর দিয়ে তার বিশাল রথটি টেনে আনে সাতটি তেজি ঘোড়া। আলোকিত হয়ে ওঠে দশদিক। আর এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সেই ব্যবস্থাটাও বহুযুগ আগেই পাকা করে রেখে গিয়েছেন অগস্ত্য মুনি। কিন্তু তাই বলে ওদিকে বরুণদেবও তো আবার ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। তাকেও যে মাঝেমধ্যে নিজের কেরামতি দেখাতেই হয়।


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

ফলে এক-একদিন আকাশ ছেয়ে যায় ভারী গম্ভীর মেঘে। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকায়। শনশন হাওয়ায় আর তুমুল বৃষ্টিপাতের সঙ্গে অন্ধকার হয়ে ওঠে চারদিক।

আজকের দিনটি ঠিক সেরকমই। আর এর ফলে যারা আজ সত্যিই খুব বিপাকে পড়েছে, কলকাতার সেবা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ-এর তরুণ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ঋষভ মিত্র তাদেরই একজন। এই মুহূর্তে বসে আছে দিল্লির ইন্দিরা গাঁধী বিমানবন্দরে। গতকাল সকালে ব্যবসা সংক্রান্ত একটা জরুরি কাজে এসে আজ ভোরের ফ্লাইট ধরে তার কলকাতা ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু গতিক দেখে মনে হচ্ছে বিধি বাম। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য সকালের প্রায় সব ক'টি ফ্লাইটই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এমনও শোনা যাচ্ছে, উড়ান শেষ পর্যন্ত নাকি বাতিলও হয়ে যেতে পারে।

ঋষভ বিরক্তভাবে বারবার ফ্লাইট ইনফরমেশন বোর্ডের দিকে তাকাচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ করেও সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কলকাতার আবহাওয়া নাকি এর চেয়েও বেশি খারাপ। তাই ওদিক থেকে সঙ্কেত না পাওয়া পর্যন্ত কেউ কিছু বলতে পারছে না। অগত্যা লাউঞ্জের নরম সোফায় বসে অসহায়ভাবে অপেক্ষা করা ছাড়া আপাতত কিছু করার নেই।

আজ দুটো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছিল ঋষভের। মনে হচ্ছে বেলা একটার কনফারেন্স কলটা ক্যানসেল করাতেই হবে। আর বিকেলের পর ভারত চেম্বার অফ কমার্সের মিটিংটায় হাজির না হতে পারলেও সমস্যা। ল্যাপটপটা খুলে ঋষভ চটপট গোটাকয়েক জরুরি ই-মেল পাঠিয়ে দিল। সে সদাব্যস্ত মানুষ। বেশ কম বয়সেই কোম্পানি তাকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদটা দিয়েছে। আর সে-পদের মর্যাদা বজায় রাখতে ঋষভকে তার মেধা, সময় ও মনোযোগের প্রায় সবটাই ঢেলে দিতে হয়। এই কোম্পানি পরিচালনার অনুষঙ্গে যা- যা কাজ তার সামনে আসে, সবটাই সে উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করে। উপভোগও করে। এই কাজই তার অবসর, তার রিল্যাক্সেশন।

লাউঞ্জের এই দিকটা একটু ফাঁকা। অধৈর্য ও উৎকণ্ঠিত যাত্রীদের ভিড় ততটা নেই। ঋষভ খবরের কাগজের হেডলাইনে চোখ রাখল। ভিতরের পাতায় আজকের ভারত চেম্বার অফ কমার্সের মিটিং-এর উল্লেখ রয়েছে। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরও এই মিটিংয়ে আসার কথা। ঝড়জলের জন্য শেষ পর্যন্ত তিনিও যদি না আসতে পারেন, মিটিং নিশ্চয়ই ক্যানসেল হয়ে যাবে।

এখন সকাল ছ'টা দশ। কলকাতায় তার আলিপুরের বিশাল ফ্ল্যাটে সোমা কি এখনও ঘুমিয়ে আছে? না বোধহয়। এয়ারপোর্টে আসার জন্য ড্রাইভার সুখলাল এখনই চাবি নিতে আসবে। সোমা নিশ্চয়ই উঠে পড়েছে এতক্ষণে।

মোবাইলে সোমাকে ধরল ঋষভ।

"ঘুমোচ্ছিলে?"

"না, বলো।"

"সুখলাল চাবি নিতে এসেছিল?"

"এখনও তো সময় হয়নি। তোমার ফ্লাইট তো আটটায় ল্যান্ড করবে!"

"ডার্লিং, ফ্লাইট ইজ গেটিং অ্যাবনরমালি ডিলেড। দেখছ না কীরকম ওয়েদার। আমি এয়ারপোর্টে হেল্পলেসলি বসে আছি। এখনও চেক-ইন শুরুই হয়নি। কখন শুরু হবে তা-ও বলা যাচ্ছে না।"

"শেষ পর্যন্ত ছাড়বে তো না কি?" সোমার গলায় একটু উৎকণ্ঠার সুর।

"জানি না। যাই হোক সুখলালকে ন'টা থেকে এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করতে বলবে। তার আগে নয়।"

"এই শোনো। আজ জিৎ কিন্তু একটু পরেই ফোন করবে। জিজ্ঞেস করবে, ড্যাড কী ডিসিশন নিল? তখন ওকে কী বলব ঋষি?"

"কী ব্যাপারে?"

"বাঃ, ভুলে গেলে? আগস্টে আমাদের নিউ জার্সি যাওয়ার ব্যাপারটা! জানতে চাইলে কী বলব?"

"ওটা নিয়ে এখনও কিছু ভাবিনি। তাছাড়া ওই সময়টায় আমাদের অফিসে একদল ফরেন টেকনিশিয়ানের আসার কথা আছে।"

"থাক! আর শোনাতে হবে না। তুমি তোমার অফিস নিয়েই থাকো। আমার আর জিৎ-এর কথা কখনও তুমি ভাবোইনি, অফিসের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে গেছ সব সময়। ইডিয়ট..."

ফোনটা আচমকা কেটে দিল সোমা। ও এরকমই। ওর রাগের কোনও স্থান-কাল-পাত্র বা সময়-অসময় নেই। এতদূর থেকে তার হাজব্যান্ড ফোন করে জানাচ্ছে, তাতেও ওর কোনও উৎকণ্ঠা বা মাথাব্যথা নেই। ঋষভ জানে, ফোন করলেও এখন আর সোমা ফোন ধরবে না।

ইডিয়ট! মনে-মনে হাসল ঋষভ। এতবড় একজন ডাকসাইটে বিগ বস যাকে সকলে সমীহ করে, তাকে তুমি এমনভাবে নস্যাৎ করে দিলে সোমা? বিয়ের পর মাত্র কয়েকটা বছর, তারপর জিৎ যেই তোমার কোলে এল, তখন থেকেই বদলে গেল তোমার ব্যবহার। সোমা, তুমি এখন কার বলো তো?

এমনসময় হঠাৎ একটা লোক এসে তাঁর সোফার একপাশে বসে পড়ল। প্রায় গা ঘেঁষেই বলা যায়। মনে-মনে বিরক্ত হয়ে ঋষভ কাগজটা খুলে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। লোকটা রীতিমতো গায়ে-পড়া স্বভাবের।

ঋষভের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে আলাপ জমাবার ভঙ্গিতে বলে উঠল, "আজ ফ্লাইটগুলো শেষ পর্যন্ত ছাড়বে তো? কী মনে হয় আপনার? বৃষ্টি তো মনে হয় এখনও ধরেনি। ভেতরে বসে ঠিক বোঝাও যাচ্ছে না।"

"আপনি বাঙালি দেখছি। দিল্লিতে কী ব্যাপারে এসেছিলেন?" ঋষভ ভদ্রতার খাতিরে প্রশ্ন করে।

"একটা বইমেলার আয়োজন করেছিল প্রবাসী বাঙালিরা। আমাকে ডেকেছিল ওই ব্যাপারে।"

"আপনি পাবলিশার?"

"না, আমি লিখি সামান্য," একটু ভদ্রতা ও সামান্য লাজুক মুখে কথাটা বলে ঋষভের দিকে আবার সোজাসুজি তাকাল লোকটা।

ঋষভ নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "ও আই সি। আর্টিক্‌ল লেখেন? নিউজপেপার না ম্যাগাজিনে? কী সাবজেক্ট নিয়ে লেখেন?"

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, "না-না ওসব নয়। ফিকশন আর কী। বাংলায় যাকে বলে গল্প-উপন্যাস।"

ঋষভ হেসে বলে, "ওসব আর কেউ পড়ে আজকাল? আমি তো এসব লেখা কোনওদিন উল্টেও দেখি না। তবে হ্যাঁ, আমার স্ত্রী একজন ভোরেশাস রিডার। হয়তো আপনার বইটই পড়ে থাকতে পারে। কী নাম আপনার?"

লোকটা এবার বেশ আগ্রহী হয়ে বলে, "বিভাস। বিভাস হালদার।" তারপর ঋষভের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। নামটা শুনে ওর কোনও প্রতিক্রিয়া হল কিনা সেটা বোধহয় বুঝতে চায়।

ঋষভ উল্টে এবার যে-প্রশ্নটা করে সেটা বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দেয় লেখক বিভাস হালদারকে।

"লেখেন তো বুঝলাম। আর কী করেন? মানে কোনও চাকরি-বাকরি?"

"না-না। আমি একজন ফুলটাইম লেখক। একটা বাংলা দৈনিকে মাঝে মাঝে ফ্রিল্যান্স করি। বছর পাঁচেক আগে পর্যন্ত বালিগঞ্জে একটা হাইস্কুলে ইতিহাস পড়াতাম। এখন সেটা ছেড়ে দিয়েছি।"

ঋষভ নড়েচড়ে বসে, "ছেড়ে দিয়েছেন? বাঙালি লেখকদের বই লিখেও ভাল ইনকাম হয়! স্ট্রেঞ্জ। আমি তো..."

ঋষভের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিভাস হঠাৎ হেসে বলে, "প্লেনে চড়ে দিল্লি থেকে কলকাতা যাচ্ছি দেখে ভাবছেন?"

ঋষভ উঠে গিয়ে থামের পাশের ছাইদানে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে এসে বলে, "সেটা তো না হয় দিল্লির বেঙ্গলি কমিউনিটি স্পনসর করেছে বুঝতে পারছি। তবুও, শুধু কয়েকটা বই লিখে বেঁচে থাকা যায় নাকি?"

"কী করে বুঝলেন বেঁচে আছি? জিন্‌স আর টি-শার্ট পরে আপনার সামনে সশরীরে বসে আছি বলে?"

শব্দ করে হাসল ঋষভ, "আপনারা লেখেন তো, তাই বেশ চটকদার কথা বলতে পারেন। যাক গে, একটা কথা অনেকক্ষণ ধরেই মনে হচ্ছে, আপনার কথা বলার স্টাইলটা কোথায় যেন শুনেছি, কিন্তু ঠিক প্লেস করতে পারছি না। আপনার নামটা কী যেন বললেন? ও, বিভাস হালদার...না এই নামে আমি সত্যি কাউকে চিনি না।"

"আমি আপনাকে একটা ক্লু দিতে পারি। দেখুন মনে পড়ে কি না।"

"তার মানে? আপনি আমাকে আগে থেকে চেনেন? আর তাই যেচে আলাপ জমাতে আসা? ওকে, দিন আপনার ক্লু। দেখি চিনতে পারি কি না।"

"সাউথ পয়েন্ট স্কুল, নাইনটিন এইটি ওয়ান। মনে পড়ছে?"

"দ্যাটস রাইট! ওয়্যার ইউ মাই ক্লাসমেট?"

"না, আপনার একটু ভুল হচ্ছে। আমরা একই ক্লাসে পড়তাম বটে, কিন্তু এক সেকশনে নয়। আপনি সায়েন্স নিয়েছিলেন। আমি হিউম্যানিটিজ। আমি স্কুলের ফাংশনে প্রায়ই আবৃত্তি করতাম। নাটকও করতাম। তাই হয়তো আপনার চেনা-চেনা লেগেছে।"

ঋষভ এবার মনে পড়ার ভঙ্গিতে বলে, "ইয়েস-ইয়েস। আপনি একবার ডাকঘর নাটকে অমল সেজেছিলেন না?"

বিভাস গলা পরিষ্কার করে বলে, "এখনও কি আপনি-টাপনি চলবে?"

ঋষভ সোৎসাহে বলে, "সার্টেনলি নট। ভালই হল বিভাস তোমাকে পেয়ে। যতক্ষণ প্লেন না ছাড়ছে, ততক্ষণ একটু আড্ডা দেওয়া যাবে। এই আমি ঋষভ মিত্র, বহুকাল বাদে এইরকম ফাঁকা কিছুটা সময় আমাকে জোর করে কাটাতে হচ্ছে। বিশ্বাস করবে না হয়তো, রাতের ঘুম ছাড়া আমার তেমন কোনও বিশ্রাম বা অবসর নেই। বাট আই লাইক দিস লাইফস্টাইল।"

বিভাস এবার সোফা ছেড়ে উঠে বলে, "যাই, দেখি ওদিকে কোনও ডেভলপমেন্ট হল কি না! তুমি বোসো। আমি এখনই আসছি।"


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

"এসো তাড়াতাড়ি। তারপর একটু কফি খাওয়া যাবে।"

একটু পরেই বিভাস এসে জানাল, "সুখবর আছে। দশটা নাগাদ প্লেন ছাড়তে পারে। ব্রেকফাস্ট কুপন নিয়ে কফিশপে যেতে বলছে সকলকে..."

"ওয়াও! গ্রেট! দাঁড়াও, বাড়িতে ফোন করে টাইমটা জানিয়ে দিই।"

ঋষভের জন্য কলকাতায় অনেক কাজ, অনেক সিদ্ধান্ত থেমে থাকবে। তাই এই দশ মিনিটের মধ্যে অনেকগুলো জরুরি ফোন সেরে ফেললো সে। বাইরে কাচের দরজা ভেদ করে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ আগের চেয়ে অনেকটা কমেছে। একটু এগিয়ে সামনে একটা বইয়ের দোকান আছে। বিভাস জানে এখানে তার মতো লেখকের বই পাওয়া যাবে না। একটা বাংলা কাগজও থাকে না এখানে।

স্যান্ডউইচ, ফ্রুট জুস আর পেস্ট্রি। শেষে বড় এক কাপ কফি।

"এই যে খাইয়ে দিল, এরপর ফ্লাইটে আর দ্বিতীয়বার কিছু দেবে বলে মনে হয় না! বড়জোর আর এক কাপ কফি। অথচ ওভারসিজ ফ্লাইটে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় হার্ড ড্রিঙ্কস আর স্ন্যাক্স পাওয়া যায়," ঋষভ বলল।

আসলে তার গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে। একটা বিয়ার খেতে পারলে ভাল হত। তার এই লেখক বন্ধুটি আবার এসব খায় কি না, কে জানে। বোধহয় নয়। বরং এইসব কবি-শিল্পীর দলটল নেশাখোর টাইপেরই হয়। সামাজিক রীতিনীতির তেমন ধার ধারে না। টাকা জমাতেও জানে না।

ইচ্ছেটা দমিয়ে রেখে ঋষভ বলে, "তোমার ফ্যামিলি সাইজ কী বিভাস?"

"কী বললে?"

"বাড়িতে আর কে-কে আছেন?"

"ও। আমার স্ত্রী আর একটি মেয়ে। বিধবা মা-ও থাকেন আমার সঙ্গে।"

"বউ আর মেয়ের নামটা তো অন্তত বলবে।"

"রুমকি, আমার বউ। আর মেয়ে, রাই। আট বছর হবে এই জুলাইতে..."

"বিউটিফুল। আমার ওয়াইফের নাম সোমা। একটি পুত্র, অরিজিৎ। সে আপাতত ইউএস-এ। স্কুলিং শেষ করেছে। তোমার স্ত্রী কী করেন?"

"একটা স্কুলে পড়ায়। তেমন কিছু নয়।"

"ভাল। সোমাও একটা এনজিও-র গভর্নিং বডির সঙ্গে যুক্ত ছিল বেশ কিছুদিন। গত বছর ইউটেরাস অপারেশনের পর এখন কিছুদিন হল বাড়িতেই রয়েছে ওই দেখো বিভাস, ওদিকে চেক-ইন শুরু হয়েছে। আচ্ছা, আমাদের সেই প্রিয়ব্রত, তরুণকান্তি, বিপ্লব এদের মনে আছে? কী করছে এরা সব জানো? আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। চলো ওঠা যাক।"

ওরা দু'জনে উঠল। রেস্তোরাঁ থেকে সোজা চেক-ইন কাউন্টার। ঋষভের বিজনেস ক্লাসের টিকিট। তাই আর একসঙ্গে বসা হবে না। বিভাসের একটা ফোন করা দরকার ছিল। বাড়িতে রুমকিকে একটা খবর দিতে হবে। ওর নিজের মোবাইলটায় রোমিং ফেসিলিটি নেই। ঋষভের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে একটা ফোন করবে নাকি? অবশ্য এখানে ফোন করার ব্যবস্থা রয়েছে।

ঋষভ বলছিল, এই এয়ারপোর্টের ডোমেস্টিক ফ্লাইটের জন্যই নাকি দুটো-তিনটে টার্মিনাল। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টটা আরও কয়েক কিলোমিটার দূরে। বিভাস অবশ্য এসব জানে না। ঋষভ নাকি মাসে পাঁচ ছ'বার দিল্লি-মুম্বই ঘুরে যায়। আর বছরে দু'-তিনবার ফরেন টুর।

এই উজ্জ্বল, আলোকিত বিমানবন্দরের ভিতরে যেসব মহিলা ও পুরুষ লাগেজ-ট্রলি ঠেলতে-ঠেলতে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের পদক্ষেপ, মুখের ভাব, পোশাক-আসাক বলে দিচ্ছে এই পৃথিবী হল উজ্জ্বল রঙিন এক রঙ্গমঞ্চ। এখানে বস্তি নেই, দারিদ্র্য নেই, নেই কোনও আবর্জনা বা ক্লেদ। আছে শুধু অহঙ্কার আর ঐশ্বর্য। একটু আগে চেক-ইন কাউন্টারে যে-দু'জন সুবেশ তরুণ-তরুণী তাকে বোর্ডিং পাস দিচ্ছিল, বিভাস লক্ষ করে দেখছিল, ওদের উজ্জ্বল গায়ের রঙ এবং মসৃণ ত্বক দেখে স্বর্গের দেবদূত মনে হচ্ছিল যেন!

তরুণীটি তাকে নম্রসুরে জিজ্ঞেস করেছিল, "স্যার ডু ইউ ওয়ান্ট উইন্ডো-সিট অর আইল?"

বিভাস একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিল, "নো-নো, উইন্ডো ইজ় অলরাইট।"

তার অপ্রতিভ মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি অবশ্য হাসেনি, বরং তার স্বাভাবিক শিষ্ট ও মার্জিত ভঙ্গিটি বজায় রেখেই বলল, "ওকে স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ। দিস ইজ় ইয়োর বোর্ডিং পাস। এনি হ্যান্ড ব্যাগেজ স্যার?"

"ইয়েস, ওনলি ওয়ান," বোকার মতো হাত নেড়ে দেখায় বিভাস।

"হ্যাভ এ নাইস জার্নি।"

থতমত বিভাস ধন্যবাদ জানাতেও ভুলে গেল। হ্যান্ডব্যাগে ওদের দেওয়া ট্যাগটা একটু চেষ্টা-চরিত্র করে কোনওরকমে একটা হ্যান্ডেলে বেঁধে নিয়ে সে সিকিউরিটি কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। একটা বিশাল সুটকেসে অযথা অনেক জামাকাপড় দিয়ে দিয়েছে রুমকি, কোনও দরকার ছিল না। মাত্র তিন-চারদিনের জন্য আসা। লাগেজটা না থাকলে দমদম এয়ারপোর্টে নেমেই সোজা বাড়ি চলে যেতে পারত সে। কলকাতার জন্য এই ক'দিনেই মন কেমন করছে। এটা তার বরাবরই হয়। কলকাতার রোদ, কলকাতার বিকেল, ট্র্যাফিক জ্যাম, রবিবার সকালে দেশপ্রিয় পার্কে নির্দিষ্ট রেস্তোরাঁয় বসে আড্ডা, রাসবিহারী মোড়ের বুকস্টল, এসব যেন একদিনও মিস করা যায় না!

ফ্লাইট ছাড়বে, ঘোষণা হওয়ার পর থেকে চারদিকে তৎপরতা ও ব্যস্ততা বেড়ে গিয়েছে। ভোর থেকে অপেক্ষা করে বসে থাকা যাত্রীরা সব একসঙ্গে চেক-ইন কাউন্টারে ও সিকিউরিটির জন্য ভিড় করছে। বিশাল লম্বা লাইন। বিভাস দেখল ঋষভ তার থেকে অন্তত দশ-পনেরোজনের আগে দাঁড়িয়ে। পিছন ফিরে একবার হাত নেড়ে ইশারাও করল তাকে।

এই ঋষভ ছেলেটা স্কুল বাসে আসত না। আসত প্রাইভেট কারে। সোনার চামচ মুখে নিয়েই জন্মেছিল। এখন আবার বিশাল এক এক্সিকিউটিভ হয়ে গিয়েছে। এয়ারপোর্টে সময় কাটাবার জন্য আজ হয়তো তাকে একটু সঙ্গ দিল, এরপর কলকাতা গিয়ে আর পাত্তা দেবে কি? বোধহয় না। তবে ছেলেটা ভাল। ওর সেকশন আলাদা ছিল। তবে খাবার সময় মাঝে-মাঝে এক জায়গায় এসে বসত দু'জনে। একসঙ্গে খেত।

মাঝে মাঝেই বলত, "আমার সঙ্গে নুডল্‌স আছে অনেকটা। শেয়ার করবে একটু?"

বিভাস সঙ্গে-সঙ্গে বলত, "না আমার পেট ভরা। পারব না।"

"নাও না প্লিজ়। আমি এতটা পারব না। না খেয়ে ফেরত নিয়ে গেলে মা-র কাছে বকুনি খেতে হবে।"

বিভাস হেসে বলত, "আচ্ছা তবে দাও...অল্প, অতটা না।"

ঘোষণা হতেই প্লেনে উঠে পড়তে হল। প্লেনে ওঠার জন্য রানওয়ে থেকে একটা বাসে উঠতে হয়েছিল। এখানে একটা সুড়ঙ্গ পথের মতো ওয়াকওয়ে দিয়ে সটান একেবারে বিমানের দরজায় এসে পৌঁছে যাওয়া যায়।

তার আগে এক জায়গায় সিকিউরিটির লোকেরা সকলের হ্যান্ড ব্যাগেজ খুলে-খুলে দেখছিল। সে আর ঋষভ পাশাপাশি। ঋষভের ব্রিফকেসে দামি সিগারেটের প্যাকেট, ক্যালকুলেটর, শেভিং সেট, লাইটার ইত্যাদি। আর বিভাসের পুরনো হাতব্যাগটায় একটা গামছা, একটা চেক লুঙ্গি, সাবান আর তোবড়ানো টুথপেস্টের একটা টিউব। এদের যেন দেখাও আর শেষ হয় না। বিভাসের এত লজ্জা করছিল! সে আড়চোখে একবার চেয়ে দেখেছিল, ঋষভ তার ব্যাগের দিকে তাকিয়ে আছে কি না। না, সে তখন মোবাইলে কথা বলতে ব্যস্ত।

প্লেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আবার কয়েকজন দেবদূত, দেবদূতী। ঝকঝকে তাদের শরীর, স্মার্ট পোশাক, মুখে স্মিত হাসি। হাত জড়ো করে স্বাগতম জানাচ্ছে সকলকে। প্রত্যেক যাত্রীর দিকেই তাদের মনোযোগ।

দু'পাশের সিটের মাঝখান দিয়ে করিডোর। সামনে কয়েকজন দাঁড়িয়ে উপরের লাগেজ র‍্যাকে সময় নিয়ে হাতব্যাগ রাখছে, পিছনের যাত্রীরা এগনোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। তাই করিডোরে জ্যাম। একজন বিমানসেবিকা এগিয়ে এসে বিভাসের সিট দেখিয়ে দিল। সিট-বেল্ট বাঁধতেও সাহায্য করল। চোখের সামনে লেখা, 'ফাস্‌ন সিট-বেল্ট' আর 'নো স্মোকিং'।

বিভাস এর আগে দু'বার প্লেনে চড়েছে। একবার গুয়াহাটি গিয়েছিল শিলং বেড়ানোর উদ্দেশ্যে। আর গত বছর গিয়েছিল বাংলাদেশের ঢাকায় একটি সাহিত্য সম্মেলনে।

বিমান ছাড়তে দেরি হওয়ার জন্য বিমানসেবিকা হিন্দিতে ক্ষমা চাইছিলেন। বিভাস সিটে সোজা হয়ে বসে বিমানসেবিকার দেখানো সুরক্ষা নির্দেশিকা পড়ছে। ওর সামনের সিটের পিছনে নেট লাগানো একটা অংশে রাখা রয়েছে এইসব নির্দেশিকা ও একটি পত্রিকা।

প্লেনটা রানওয়ে ধরে এবার আস্তে-আস্তে এগোচ্ছে। এয়ারপোর্ট বিল্ডিংটা দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। বৃষ্টির জন্য রানওয়েতে অল্প জলও জমে আছে। ঝিরঝির বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। বেশ খানিকটা এগিয়ে রানওয়েটা শেষবারের মত ছাড়ার আগে প্লেনটা থামল একবার। বোধহয় টেক-অফের আগে দম নিয়ে তৈরি হয়ে নিচ্ছে। যেমন রেসের দৌড়ে হয়।

ঋষভ বসে আছে বিজনেস ক্লাসের সামনের দিকে। ওদিকটা বেশ ফাঁকা। বিমানসেবিকারা মিষ্টি হেসে কথা বলছে ওর সঙ্গে। মাঝে-মাঝেই বেল বাজিয়ে বিমানসেবিকাদের ডাকছে যাত্রীরা। বিভাসের পাশে দু'জন অবাঙালি স্বামী-স্ত্রী। বিভাসকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছে না। নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলিতেই ব্যস্ত। বিভাস গায়ে পড়ে একবার আলাপ করতে গিয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে। পাত্তা দেয়নি।

ঋষভ একবার সামনের দিক থেকে পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে হাত নেড়েছিল। এখন পর্দা টানা তাই তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না। প্লেনটা দ্রুত গতিতে রানওয়ে ধরে ছুটছে। তারপর একসময় টেক-অফ করে শূন্যে উঠে গেল। নীচের দিল্লি শহরের ঘরবাড়ি প্রান্তর নদী যেটুকু বোঝা যায়, মেঘের মধ্য দিয়ে সব যেন কখনও জানালার সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে কখনও বা পায়ের

Be familiar with www.banglatorrents.com

নীচে চলে যাচ্ছে। ঘরবাড়ি মনুমেন্ট গাড়িঘোড়া, সব এখন ধীরে-ধীরে খেলনার মতো ছোট হতে-হতে একসময় ঘন মেঘের আড়ালে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই মেঘের স্তরগুলো পেরনোর সময় বেশ ঝাঁকুনি দিচ্ছিল প্লেনটা, দুলছিলও বেশ। তারপর বেশ কয়েক মিনিট পরে অনেকটা উঁচুতে উঠে একসময় গতিপথ ঠিক করে নিল বোধহয়। তারপর শুধু মসৃণ চলা। স্থির নিশ্চল বায়ুদূতের মতো।

'ফাস্‌ন ইয়োর সিট-বেল্ট' সঙ্কেত উঠে যেতেই এতক্ষণ বাধ্য ছেলেমেয়ের মতো পাশাপাশি বসে থাকা বিমান সেবক-সেবিকা দু'জন উঠে পড়ল। আর একটু পরেই শুরু হল খাবার দেওয়ার পালা।

সামনের সিটের পিছন থেকে ছোট খাবার ট্রে নামিয়ে নিয়েছে সকলেই। আবার আর-একপ্রস্থ ব্রেকফাস্ট। জ্যাম আর মাখনের ছোট-ছোট দুটো প্লাস্টিক বক্স আর বড় একটা কেক সকলের অলক্ষ্যে বিভাস সরিয়ে নিয়ে তার হাতব্যাগে ভরে ফেলল। আসার দিনটায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে ভেবে নেয়নি। রাই এগুলো পেলে খুশি হবে। তার মেয়েটার অবশ্য কোনও চাহিদা নেই। তবে এবার বলেছিল, "বাবা দিল্লি থেকে আমার জন্য কী আনবে?"

"তোর জন্য? দিল্লিকা লাড্ডু," মজার গলায় বলেছিল বিভাস।

রাই অবাক হয়ে বলে, "খুব বড় বুঝি? খুব মিষ্টি বুঝি বাবা?"

"হ্যাঁ খুব বড়, খুব মিষ্টি। খেলেই পস্তাতে হয়। যেমন আমার হয়েছে..."

বালিশে ওয়াড় পরাতে-পরাতে রুমকি গম্ভীর গলায় বলেছিল, "ও আবার কী কথা মেয়ের সঙ্গে? ছেলেমানুষ জিজ্ঞেস করছে কী আনবে, সত্যি কথাটা বলে দিতে পারছ না?"

খুব ভোরে উঠে এয়ারপোর্টে আসতে হয়েছে সব যাত্রীকে, তাই খাওয়ার পর প্রায় প্রত্যেকেই সিটে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে। দু'-একজন কাগজ পড়ছে অথবা সিটে লাগানো ছোট মনিটর স্ক্রিনে ছবি দেখছে।

বিভাসও চোখ বুজল। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়ল দময়ন্তীর কথা। অনেকদিন ওর সঙ্গে ফোনে কথা হয়নি। ইচ্ছে করলেই হুটহাট বিলাসপুরে চলে যাওয়া যায় নাকি? তার উপর আবার রুমকির চোখে ধুলো দিয়ে!

"এক্সকিউজ় মি স্যার।"

বিভাসের তন্দ্রা ভেঙে গেল। একজন বিমানসেবিকা তাকে ডাকছে।

"স্যার, মিস্টার ঋষভ মিটরা ইজ় কলিং ইউ দেয়ার।"

বিভাস বাংলায় বলে ফেলল, "যাব?"

"হ্যাঁ, যান না!," মেয়েটি মিষ্টি হেসে বাংলাতেই বলল।

ঋষভের কাছে যেতেই সে পাশের খালি সিটটা দেখিয়ে ওকে বসতে বলল, "এখনও প্রায় আধ ঘণ্টা। চলো গল্প করা যাক। ঘুমোচ্ছিলে নাকি?"

"না।"

"তাহলে একটু বোসো। ওরা আপত্তি করবে না। এই ফ্লাইটে এর আগে আমি অনেকবার উঠেছি। ওরা আমায় ভাল করে চেনে।"

"প্লেন জার্নি বেশ বোরিং। তাই না? তবে এই বিজ়নেস ক্লাসে বেশ পা ছড়িয়ে বসা যায়। আমরা যেখানে বসেছি সেখানে স্পেস বড্ড কম।"

"তোমার কনট্যাক্ট নাম্বারটা তো দিলে না বিভাস। এখনই বলো, সেভ করে নিচ্ছি। এয়ারপোর্টে নেমেই আমি খুব ব্যস্ত হয়ে যাব। আমার ট্রাভেল শিডিউল এলোমেলো হয়ে গিয়েছে বলে অফিসের কাজও থমকে আছে..."

প্লেন বোধহয় এবার কলকাতার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। এদিকের আবহাওয়াও ভাল নয়। ভারী-ভারী মেঘ যেন গ্রাস করে নিচ্ছে প্লেনটাকে। প্লেনটা আবার খুব দুলছে। বেশ জোরেই দুলছে। একবার কয়েক হাত নীচে চলে যাচ্ছে, আবার উপরের দিকে উঠে আসছে। মাথার উপরের লাগেজ র‍্যাক, জানালার শাটার, সব ঝনঝন শব্দ করে কাঁপছে। দু'-একটা ব্যাগ ছিটকে পড়ল এদিক-ওদিক। সিট-বেল্ট বেঁধে নিতে বলা হয়েছে সকলকে। বিমানসেবিকারাও সিট-বেল্ট বেঁধে বসে পড়েছে। ওদেরও মুখ গম্ভীর। থমথমে। আশঙ্কা কি তাহলে শেষ পর্যন্ত সত্যি হতে চলেছে? ক্যাপ্টেন ঘোষণা করেছেন, প্লেন একটু বিপদের মুখে পড়েছে।

ওইটুকু বলেই অবশ্য ওঁরা চুপ করে গিয়েছেন। মনে হচ্ছে, প্লেনটা যেন ক্যাপ্টেনের নিয়ন্ত্রণ বা যন্ত্রের কোনও কলাকৌশলই আর মানছে না। সব নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। ঘন মেঘেদের রাজ্যে এই বিশাল ভারী বিমানখানা যেন একটা তুচ্ছ খেলনার মতো টালমাটাল হয়ে যাচ্ছে। সকলের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। মহিলাদের কান্নার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে আশপাশ থেকে। ঋষভ "ও গড" বলে হাতচাপা দিল মুখে।

বিভাস সিটের হাতল চেপে ধরে বসে ছিল। মৃত্যু এত তাড়াতাড়ি এল তাহলে? ভয় নয়, ভাবনা নয়, একটা কেমন অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে যেন। পাশে তাকিয়ে সে একবার দেখল ঋষভকে। মুখে চাপা দেওয়া ঋষভের হাত দু'খানা কাঁপছে খুব।

আর প্লেনটা যেন এখন সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে অতলে।

**এ এক জোনাকি মন, জ্বলে আর নেভে**

বেলা দুটো নাগাদ একটা ট্যাক্সি এসে থামল গলির মুখটায়। উমারানি দ্রুত বারান্দায় এসে দেখলেন ট্যাক্সির গাড়ি থেকে নামছে বিভাস। দৃশ্যটা দেখে মনে-মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁর রাগও হল খুব।

বিভাস এসে ঘরে ঢুকতেই রাগে ফেটে পড়লেন উমারানি। "হ্যাঁ রে, তোর আক্কেল কাণ্ডজ্ঞান কবে হবে বলতে পারিস? সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস, তারপর একটা ফোনও করতে পারিসনি? কী এত রাজকার্য ছিল রে ওখানে তোর? তুই যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটা ধুম জ্বরে পড়েছে। বউমা একেবারে নাকালের একশেষ..."

বিভাসও স্বর চড়িয়ে বলে, "আর আমি যে এদিকে মরতে-মরতে বেঁচে ফিরলুম, সে খবর কি রাখো? এত দেরি হল কেন বাড়ি ঢুকতে সে-কথা তো কই একবারও জিজ্ঞেস করলে না?"

উমারানি থমকে গিয়ে বলেন, "ওমা, ও কী অলক্ষুণে কথা? মরতে-মরতে বেঁচে গিয়েছিস মানে? কী হয়েছিল বিভু?"

বিভাস এসে ঘরে ঢোকে। মেয়েটা চুপ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বিভাস ওর কপালে হাত দিয়ে বুঝল মায়ের এত রাগের কারণটা। জ্বর মনে হয় এখনও একশোর কাছাকাছি।

"তোমার বউমাটি কোথায়? রোগা মেয়েটাকে একা ফেলে রেখে স্কুলে গিয়েছে নাকি?"

"বলছি বলছি। তার আগে বল তোর কী হয়েছিল, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে যে আমার।"

"আসার সময় প্লেনটা আর-একটু হলেই একেবারে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল আর কী! অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছি এ যাত্রা। সকাল থেকে কী বৃষ্টি, প্লেন ছাড়ছিলই না। আকাশের অবস্থা তো দেখছই আজ সকাল থেকে।"

"এই দুর্যোগের মধ্যে না বেরুলেই কি হচ্ছিল না তোর? ঈশ্বরের কৃপায় বেঁচে গিয়েছিস, এই আমার ভাগ্য। মন সকাল থেকেই খালি কু-ডাক ডাকছিল কি আর অমনই-অমনই?"

"মেয়েটা আমার কতদিন ভুগছে মা?"

"এই তো তোর যাওয়ার পরপরই জ্বরে পড়েছে। একশো চার-পাঁচ ডিগ্রির উপর জ্বর উঠেছিল। বউমাকে বললুম, শুধু ওষুধে হবে না। মাথা ধুইয়ে দাও। ওতেই কাজ হয়েছে অনেকটা। জ্বর অনেকটাই নেমেছে। ঝোলভাত দিয়েছি আজ। তবে খুব দুর্বল।"

"বউমা কোথায় বললে না তো? রক্ত পরীক্ষা করিয়েছিলে রাইয়ের?"

"বউমা এতদিন বাড়ি থেকে প্রায় বেরোতেই পারেনি। বাজার দোকান বন্ধ। আজ কোথায় যেন সরকারি স্কুলে পরীক্ষা হচ্ছে। সেখানে গার্ড দিতে গিয়েছে। বিকেলের আগেই ফিরবে। ওরও কি কম ঝক্কি গিয়েছে? রক্ত পরীক্ষা করানো, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, ওষুধ কিনে আনা, সব মেয়েকে ফেলে একা-একাই করতে হয়েছে।"

রাই বাবার হাত ধরে বলে, "বাবা তুমি আমার কাছে আর একটুখানি বোসো না। তারপর চান করতে যেও।"

বিভাস মেয়ের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বলে, "কী করে হঠাৎ এমন জ্বর বাধালি বল তো?"

রাই অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, "আমি কি ইচ্ছে করে জ্বর বাধিয়েছি? আমার এমন জ্বর হয়েছিল যে, সব যেন ঝাপসা লাগত। মনে হত আমায় কেউ নিয়ে যেতে এসেছে। আমি মরে গিয়েছি।"

বিভাস মৃদু হেসে বলে, "ও তাই? বেশ পাকা পাকা কথা শিখেছ দেখছি। কে শেখাল? নিশ্চয়ই তোমার মা?"

বিভাসের হঠাৎ নিজেকে খুব স্বার্থপর মনে হয়। মেয়েটা এত কষ্ট পেয়েছে, ওর জ্বরে রুমকিরও কত ধকল গিয়েছে। আর সে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মত কোথাকার কোন বইমেলা নিয়ে মত্ত ছিল। তবে বাড়িতে ফোন করলেই তো রুমকি একরাশ সমস্যা নিয়ে নাকে কাঁদবে, তাকে দায়িত্বহীনতার জন্য দুষবে। তার চেয়ে ওইসব বাইরের লোকজন যারা তাকে মাথায় নিয়ে নাচছে আর স্তুতি করছে, তাদের নিয়ে এইসব সাংসারিক সমস্যা থেকে যতটা দূরে থাকা যায়, ততই ভাল।

এই ধরনের নিষ্ঠুর মনোভাব অবশ্য তার আগে ছিল না। সংসারের উপর



Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

তার টান যে আলগা হয়ে গিয়েছে, তার প্রধান কারণ রুমকি। তার সঙ্গে আজকাল মা-ও কোমর বেঁধে যেন পিছনে লেগেছে। তার গুণ, খ্যাতি তাঁদের কাছে কিছুই না। ওরা বলে, শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। বই বিক্রি না হলে, যথেষ্ট পয়সা না আসলে, সংসার চলবে কীভাবে? তাছাড়া লিখে ক'টা টাকাই বা আসে ঘরে! এর চেয়ে চাকরি করা ঢের ভাল।

এর কোনও সদুত্তর বিভাসের জানা নেই। এসব নিয়ে ভাবলে আরও কষ্ট পেতে হবে। তার চেয়ে বরং না ভাবাই ভাল। সে মেয়ের পাশে বসে থাকে। ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

রুমকির সঙ্গে বিভাসের বিয়ে হয়েছে একটু বেশি বয়সে। রোজগার ছিল না তেমন। তাই অনেকদিন দু'জনে অপেক্ষা করেছে। আর ভেবেছে, বিভাস কবে বড় লেখক হবে। বড়-বড় কাগজে নিয়মিত লিখবে। অমনিবাস বেরুবে। পুরস্কার আসবে। এই স্বপ্ন বাস্তবিক তারা দেখতে শুরু করেছিল। কেননা বিভাস প্রথমটায় বেশ ভাল প্ল্যাটফর্ম, নিয়মিত লেখার সুযোগ ও স্বীকৃতি পাচ্ছিল। ওর লেখক জীবনের সূচনাটা ছিল বিশেষ সম্ভাবনাময়।

আজ সকালে দিল্লির এয়ারপোর্টে ঋষভ একটা খাঁটি মন্তব্য করেছিল। বাংলা বই বা বাংলা সাহিত্য আজকাল আর সত্যিই কেউ পড়ে না। এখন টাকা রোজগার করতে গেলে খুব ভাল করে ক্রিকেট খেলা শিখতে হয়। নয়তো গানের ব্যান্ড তৈরি করে অ্যালবাম বের করতে হয়। কিংবা হতে হয় ঋষভের মতো একজন বিশাল কর্পোরেট ফিগার। আবার মাঝে মাঝে এমন ঘটনাও ঘটে যখন মনে হয় লেখক হওয়াটাও সার্থক। এই যেমন আজ কলকাতা এয়ারপোর্টের ভিড়ে সে আর ঋষভ যখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লাগেজের অপেক্ষায়, তখন কোথা থেকে দু'জন সুন্দরী তরুণী এসে বিভাসের অটোগ্রাফ চাইল। পাশে অতবড় একজন কর্পোরেট ব্যক্তিত্বকে তারা চেনে না। পাত্তাও দিল না। আর গত বছর বাংলাদেশেও তাকে নিয়ে যা করেছিল সকলে, তা এককথায় অভাবনীয়। অথচ মা বা রুমকি এসব ঠান্ডা মুখ করে শুধু শোনে। কোনও মন্তব্য করে না।

বিভাসের চিন্তায় ছেদ পড়ল। রুমকি ফিরেছে বোধহয়। কড়া নাড়ার শব্দে মা দরজা খুলতে গেলেন।

"কখন ফিরলে?" রুমকি প্রশ্নটা করল বেশ নিরাসক্তভাবে। যেন উত্তর না পেলেও চলবে।

বিভাস অন্যদিকে তাকিয়েই বলল, "এই তো কিছুক্ষণ হল। এসে দেখছি রাইয়ের এই অবস্থা। কী করে হল?"

রুমকি স্বর স্বাভাবিক রেখে বলে, "একটা ফোন করলেই খবর পেতে। সংসারের জন্য, আমাদের জন্য কখনও তো ভাবলে না। নিজের জগৎ নিয়েই মশগুল। তাতে কীভাবে সংসার চলে তুমিই জানো!"

বিভাস বিরক্ত স্বরে বলে, "আসতে-না-আসতেই আবার শুরু করলে?"

রাই বিছানা থেকে উঠে বসার চেষ্টা করে বলে, "মা জানো, বাবাদের প্লেন না হুমড়ি খেয়ে আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। তাই না বাবা?"

রুমকি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু অবিশ্বাসের সুরে বলে, "কী হয়েছে? প্লেন আকাশ থেকে... কী হয়েছে?"

এই সময় উমারানি ঘরে ঢুকে বলেন, "ওঃ বউমা সে কী কাণ্ড! এই ঝড়জলের মধ্যে ওদের এরোপ্লেন নাকি একেবারে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল...!"

রুমকি ফ্যাকাসে মুখে বলে, "তারপর?"

বিভাস সবিস্তারে সব ঘটনাটা বলে। শুনে রুমকির এবার সত্যি গায়ে কাঁটা দেয়। শাশুড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে সে এগিয়ে এসে বলে, "তুমি তো ঠাকুর-দেবতা একদম মানো না। জানি না, তোমার মতো নাস্তিককে নিয়ে আমার ভাগ্যে কী আছে!"

রুমকির চোখ ভিজে ওঠে। বিভাস সেটা লক্ষ করে। ভাবে সংসারের প্রতিদিনের অসহনীয় ঘটনাগুলিই শেষ কথা নয়। মাঝে-মাঝে চারপাশে এমন একটা সুবাতাস দেয়, এমন একটা আলোর ঝলকানি লাগে ক্ষণিকের জন্য যে, মনে হয় বেঁচে থাকাটা সত্যিই সুখের।

খেতে বসে বিভাস ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছে দেখে উমারানি বললেন, "অবেলায় খিদেটা মরে গিয়েছে। হবে না? বেলা তিনটে বাজে যে। আর-একটু অন্তত খা।"

"ভাল লাগছে না মা। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। সেই রাত চারটের সময় ঘুম থেকে উঠেছি। আমার মতো কুঁড়ে লোকের এসব বাজে ধকল সয়?"

বিভাসের মাথাটা ধরে আছে অনেকক্ষণ থেকে। তাছাড়া প্লেন দুর্ঘটনায় পড়ার সময় থেকে এবং প্লেন ল্যান্ড করার মুহূর্ত পর্যন্ত যে-মানসিক অবস্থা হয়েছিল, তার রেশ যেন এখনও থেকে গিয়েছে।

কোনওরকমে খেয়েদেয়ে বিভাস রাইয়ের একপাশে শুয়ে পড়ে। অবেলার ঘুম। তেমন গাঢ় হয় না। মাঝে-মাঝে চটকা ভেঙে যাচ্ছে। সিলিংয়ে ঝোলানো ঘুরন্ত পাখাটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও বুঝতে পারে না সে কোথায় শুয়ে আছে। দিল্লিতে তিন-চারদিন চিত্তরঞ্জন পার্কের যে-বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানেও রাতে শুয়ে এরকম মনে হয়েছিল তার। জায়গা বদলালে এরকম হয় বিভাসের।

উঠে এক কাপ চা খেতে পারলে ভাল হত। এসে থেকে অবশ্য দু' কাপ হয়ে গিয়েছে। তবু আর এক কাপ মন চাইছে। রুমকিকে ডেকে বলতেই সে উঠে গেল রান্নাঘরে চায়ের জল চাপাতে।

দিল্লি থেকে এক প্যাকেট চানাচুর আর এক বাক্স কালাকাঁদ নিয়ে এসেছে বিভাস। চায়ের সঙ্গে সেসব সাজিয়ে রুমকি ঘরে ঢুকতেই সে হেসে বলল, "বাড়ি ছিলাম না বলে কি স্পেশ্যাল ট্রিটমেন্ট? তোমরা খাও বরং।"

"মা বাইরের জিনিস খান না জানো তো? রাইকে দেব, তবে বেশি নয়।"

"মা খাবে না কেন? এ তো সব নিরামিষ..."

"হোক না। তুমি রাস্তায় এঁটো হাতে ধরেছ না কী করেছ, কে জানে। ওসব ছাড়ো। তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কিছু কথা আছে।"

বিভাস এইবার একটু দমে গেল। বেশ হালকা চালে সহজ সরল কথাবার্তা হচ্ছিল, তার মধ্যে আবার হঠাৎ জরুরি কথা এসে পড়ল কেন? সত্যি রুমকি জীবনটা উপভোগ করতে জানে না। উইসডম বলে কিছু নেই। শুধু ঘরকন্না আর দৈনন্দিন সমস্যায় ডুবে আছে।

রাই ঘুমোচ্ছে। ওর জ্বরটা এখন অনেক কম। সন্ধ্যের দিকে যদি আর জ্বর না বাড়ে, তবে মনে হয় চিন্তা নেই। ওর জ্বরটা তাড়াতাড়ি সারলে যেন বাঁচা যায়। নইলে ঘরবন্দি হয়ে কতদিন থাকতে হবে কে জানে।

জরুরি কথা আছে শুনলেই বিভাসের টেনশন হয়, আর না শোনা পর্যন্ত সেটা কমেও না কারণ এর সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী জড়িয়ে আছে সংসারের দায়দায়িত্ব কাজকর্ম, যেটা বিভাসের খুবই অপছন্দের বিষয়।

"দায়সারাভাবে শুনলে হবে না। মন দিয়ে শুনতে হবে। উঠে বোসো।"

"আহা, বলোই না। মন দিয়ে শুনছি।"

"আমাদের কি চিরকাল এই এঁদো গলির মধ্যে ভাড়া-বাড়িতেই জীবন কাটিয়ে দিতে হবে? বিয়ের পর থেকে এই একই কামরা, একই অন্ধকূপ। তোমার কী ইচ্ছে করে না একটু ভালভাবে থাকতে?"

"ইচ্ছে তো করে রাজভবনে গিয়ে থাকতে। তা বলে সেটা কি সম্ভব?"

"ঠাট্টা কোরো না তো, সিরিয়াসলি একটু ভাবো। আমি একটা জমির খোঁজ পেয়েছি। খুব সস্তায়। সত্তর-আশি হাজারে দু'-তিন কাঠা জমি হয়ে যাবে। আমাদের স্কুলের হেনাদির বাপের বাড়ি ভদ্রেশ্বর, ওখানে।"

বিভাস চায়ের কাপ রেখে বলে, "সত্তর-আশি হাজার? তা-ও আবার ভদ্রেশ্বর? কলকাতা ছেড়ে আমি থাকতেই পারব না।"

রুমকি একটু রেগে বলে, "এক লাখ টাকা চাইছিল। হেনাদি আমায় আপনজনের মতো দেখেন, তাই বলে-কয়ে অনেক কম করে দিয়েছেন। কলকাতা শহরে বাড়ি তৈরি করার মুরোদ আছে তোমার?"

বিভাস একটু চুপ করে থেকে বলে, "সত্তর-আশি হাজার টাকাই বা কে দেবে? আমার অত টাকা যে নেই, সে তো তুমি জানো। যা আসে লিখে, সংসার চালাতে তার অর্ধেক চলে যায়। মেরেকেটে হাজার তিরিশের মতো পাবলিশারের কাছ থেকে পেতে পারি।"

রুমকি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, "টাকা থাকত যদি মদ না গিলতে! সত্যি বলছি, তোমায় বিয়ে করে যে কী ভুল করেছিলাম।...আমার স্কুলের প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত লোন পাওয়া যাবে। বাকিটা তোমায় জোগাড় করতেই হবে। সে যে করেই হোক।"

"প্রভিডেন্ট ফান্ডে হাত দিও না। রাইয়ের বিয়ে দিতে লাগবে।"

"ওঃ ওর কথা ভেবে তোমার যেন ঘুম হয় না! তোমায় চিনতে আমার বাকি নেই। শোনো, তোমার দু'-চারজন পাবলিশারকে ধরো। ওরা তোমায় ঠিক সাহায্য করবে।"

"তুমি জমিটা দেখেছ?"

"টাকাটার একটা ব্যবস্থা করো। তারপর তুমি আর আমি দু'জনে গিয়ে জমি দেখে আসব। শুনেছি খুব ভাল জায়গা। দক্ষিণ খোলা প্লট। বাজার দোকান স্কুল সব খুব কাছাকাছি।"

"তুমি ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে পারবে রুমকি? ট্রেনে যা ভিড় হয়!"

"এখন চেতলা থেকে হাওড়া পর্যন্ত যাই রোজ পড়াতে। তখন ভদ্রেশ্বর থেকে মোটে হাওড়া। আরও অনেক কাছে হবে না?"

ওদের কথাবার্তার মাঝে রাইয়ের ঘুম ভেঙে যায়। সে ওঠার চেষ্টা করে বলে, "মা জল খাব।"

"জল আমি দিচ্ছি সোনা। তুমি শুয়ে থাকো। উঠে বসলে মাথা ঘুরবে।"

সন্ধের দিকে ল্যান্ডলাইনে একটা ফোন এল।

"হ্যাঁ বলুন..."


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

"ফিরেছিস তাহলে? তোর মোবাইল বন্ধ দেখে ভাবলাম, ফিরিসনি বোধহয়," ও-প্রান্তে অলকেন্দুর গলা।

"মেয়েটার খুব জ্বর, ঘুমোচ্ছে। তাই মোবাইলটা বন্ধ ছিল। তারপর, খবর-টবর ভাল? আমি তো প্রায় মরতে-মরতে বেঁচে ফিরেছি বলতে পারিস।"

"তার মানে?"

বিভাস প্লেনের ঘটনাটা বর্ণনা করে শোনায় বন্ধু অলকেন্দুকে।

অলকেন্দু বলে, "তার মানে কাল পেপারে দেখতাম তুই শালা নামের আগে একটা চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে বসে আছিস! ভাবতেও কেমন যেন লাগছে।"

"দ্যাখ অলক, আমাদের মতো লোকদের মরার খবর-টবর কাগজে বেরোবে না। আর বেরোলেও সেটা হয়তো সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে। সে কারও চোখে পড়বে না।"

"মাইরি, তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। তোর বউ সব শুনেটুনে খুব ঘাবড়ে গেছে নিশ্চয়ই? আর মাসিমা?"

"ওদের কথা ছেড়েই দিলাম। আমার নিজেরই এখনও ট্রমার মত ভাবটা ঠিক কাটেনি। কেমন একটা ভ্যাবলা ভাব হয়ে রয়েছে রে। তাই তোদের সকলের সঙ্গে কথা বলে যতদূর সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করছি। তবু শুনলে অবাক হবি, ঐ অবস্থায় প্লেন থেকে নামার পর দুটো মেয়ে এয়ারপোর্টে অটোগ্রাফ চাইল, সেটাও দিয়েছি খুব স্বাভাবিকভাবেই।"

"সুন্দরী নিশ্চয়ই?"

"তাতে কী?"

"ওরা মুনি-ঋষিদের ধ্যান ভঙ্গ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে! তোর ট্রমা তো নস্যি।"

" ভাই অলক, তুই আমাকে অনেকটা স্বাভাবিক করে দিলি এই কয়েক মিনিটের মধ্যে...।"

আসলে প্লেন দুর্ঘটনায় পড়ার ধাক্কাটাও বোধহয় বিভাস সামলে নিয়েছিল। কিন্তু দুপুরে অবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর রুমকি ওই জমি এবং টাকাকড়ির ভাবনাটা মাথায় ঢুকিয়ে, তাকে ভিতরে-ভিতরে বেশ মুষড়ে দিয়েছে। তারপর কলকাতা ছেড়ে ভদ্রেশ্বরে গিয়ে থাকা। ওখানে বইপাড়া নেই, কফি হাউজ নেই, দেশপ্রিয় পার্কের রেস্তোরাঁ নেই, অ্যাকাডেমি, নন্দন চত্বর, কিচ্ছু নেই। এরকম একটা জায়গায় গিয়ে দক্ষিণ খোলা প্লটের বারান্দায় বসে গঙ্গার হাওয়া খাওয়া! রুমকি যা-ই বলুক, সে ওখানে যাবে না।

ও-প্রান্তে অলকেন্দু বলে, "কী হল, চুপ করে গেলি যে? শোন, আসল কথাটা বলি। কাল একবার বিকেলে আসতে পারবি?"

"কোথায়, তোর অফিসে?"

"অফিসেও আসতে পারিস, কিংবা কার্জন পার্কের সামনে। যেখানেই হোক, হাতে সময় নিয়ে আসবি কিন্তু।"

"ব্যাপারটা কী রে?"

"ফোনে সব বলা যাবে না ব্রাদার। এলে বলব।"

"একটু হিন্ট্স তো দিবি শালা।"

"ওই আমার আর চান্দ্রেয়ীর ব্যাপারটা নিয়ে আর কী! তোরা জানিস সব ঠিকঠাক চলছে, আসলে তা কিন্তু নয়। সম্পর্কটার মধ্যে গোটাকয়েক প্রশ্নচিহ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। তোকে ভেবেচিন্তে একটা অ্যাডভাইস দিতে হবে।"

তার মানে এই সম্পর্কটাও শেষ পর্যন্ত টিকল না। দোষটা অলকেন্দুর না অপর পক্ষের সেটা এর আগে দময়ন্তীর সঙ্গে ওর হঠাৎ ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময়ও পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারেনি বিভাস। এখনও পারছে না। অলকেন্দু বেশ খোলা মনের মানুষ। হাসিঠাট্টা ইয়ার্কি নিয়েই থাকে। মেয়েরা সেটা হয়তো তেমন পছন্দ করে না।

অলকেন্দুই বিভাসকে দময়ন্তীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ওদের দু'জনের বিয়ের কথা তখন সব পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে। দময়ন্তী বিভাসের লেখা 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসটি পড়ে একটা উচ্ছ্বসিত আলোচনা লিখেছিল নামী এক পত্রিকায়। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপিকা এই মেয়েটির সমালোচক হিসেবে পরিচিত মহলে মোটামুটি একটা সুনামও হয়ে গিয়েছে ততদিনে।

বিভাস লেখাটা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিল। আর দময়ন্তী মুগ্ধ হয়েছিল বিভাসকে দেখে। তাই বোধহয় অলকেন্দুর স্ত্রী হয়েও তার বুকের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বিভাসের জন্য বেহিসাবি এক ভালবাসা। সকলের অজান্তে গোপনে তারা দেখা করতে শুরু করেছিল। বিনা ভূমিকায় দময়ন্তীর হাতটা নিজের হাতের মুঠিতে তুলে নেওয়ার বা বিনা দ্বিধায় তার ঠোঁটে নিজের কম্পিত ঠোঁটটি স্পর্শ করার অধিকারটুকু সে অনায়াসে অর্জন করে নিয়েছিল দময়ন্তীর কাছ থেকে।

"কী রে, কী হয়েছে বল তো? মাঝে-মাঝে কথা বলতে-বলতে হঠাৎ চুপ মেরে যাচ্ছিস কেন? মনে হয় আজকের সকালের ঘটনাটায় তোর একটা বড়সড় মেন্টাল শক হয়েছে। পারলে একটা লেডি সাইকায়াট্রিস্টের কাছে যা। ওরা আইডিয়াল," কথাটা বলে অলকেন্দু নিজের রসিকতায় হাসে খুব।

বিভাস বলে, "না রে, ঠিক তা নয়। বাড়ি এসে দেখছি মেয়েটার খুব জ্বর আর তারপর সকালে ওই বিপদের মধ্যে পড়া। সব মিলিয়ে..."

"বুঝলাম। মেয়েটাকে ডাক্তার দেখিয়েছিস তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন অনেকটা ভাল। জ্বর অনেকটাই কম...ও, একটা কথা তো বলাই হয়নি! স্কুলে আমাদের ব্যাচের ঋষভ মিত্রকে তোর মনে আছে?"

"কে, ঋষভ মিত্র?"

"হ্যাঁ, বিশাল চাকরি করে এখন।"

"আরে ওকে চিনব না? কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের রাইজিং স্টার। কলকাতা বেস্ড বিজনেস ম্যাগনেট না হলে এতদিনে ন্যাশনাল ফিগার হয়ে যেত।"

"তুই কী করে চিনলি?"

"আমাদের কোম্পানি তো ওদের প্রোডাক্টগুলো মার্কেটিং করে। সেই সূত্রেই চেনা। তবে আমার সঙ্গে তত আলাপ নেই। আমার বস কিংশুক মুখার্জি ওকে খুব তেল দিয়ে চলে। ঋষভ শুনেছি খুব ডায়নামিক লোক।"

"অনেক খবরই রাখিস দেখছি। ও কিন্তু আমাদের স্কুলে একই ব্যাচের। তবে সায়েন্স গ্রুপ। তাই তোর সঙ্গে আলাপ ছিল না স্কুলে। আমার সঙ্গেও তেমন ছিল না। দিল্লি এয়ারপোর্টে বসে আলাপ হল। তবে কী জানিস..."

"কী?"

"প্লেনটা যখন আজ সকালবেলা আকাশে নাগরদোলার মত ঘুরপাক খাচ্ছিল তখন আমার পাশে বসা ঋষভের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম। দেখছিলাম মুখে চাপা দেওয়া ওর দুটো হাত থরথর করে কাঁপছে। তখন মনে হল, পদমর্যাদা, অহমিকা সব কেমন তুচ্ছ হয়ে যায় অমোঘ মৃত্যুর সামনে।"

"বিভাস, তুই সত্যি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিস। এখন ফোনটা রাখ। কাল বিকেলে বরং অফিস ছুটির পর ঠিক চলে আসিস। ভুলে যাস না যেন।"

আজ রাতে নেশা না করলে চলবে না। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, যেন বশে নেই। সে কি সকালের দুর্ঘটনার জন্য, নাকি রুমকি মাথার মধ্যে একরাশ ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়েছে বলে? সব মিলিয়ে কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে নির্ঘাৎ।

সকলে শুয়ে পড়লে বিভাস পাশের ছোট কাঠের আলমারির দেরাজ থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করে আনল। বেশি নেই। তলানি খানিকটা পড়ে আছে। ওতেই হবে। জগ থেকে একটু জল মিশিয়ে ধীরে-ধীরে চুমুক দিল কয়েকবার। সে যে নিয়মিত এসব খায়, তা নয়। তবে মাঝে-মাঝেই খায়। শুধু মন খারাপ হলে নয়, মন ভাল থাকলেও খায়। খেলে মনটা যেন হাওয়ায় ফুরফুরে প্রজাপতির মতো ভাসতে থাকে। কলম থেকে ঝরনার স্রোতের মতো লেখা বেরিয়ে আসে অবলীলায়।

মা আজকাল খুব রাগ করে, প্রায়ই বলে, "একটা কুলাঙ্গার তুই জন্মেছিস এই বংশে। লিখিস তো ছাইপাঁশ। লেখ দেখি শরৎবাবুর মতো, পড়ে কান্নায় বুক ভেসে যাক। একশো বছর পরেও মনে হয় যেন, একটুও পুরনো হয়নি! লেখ ওরকম, লিখে দেখা। তোদের এখনকার লেখকদের তো ভাষা নেই, বর্ণনা নেই, গল্প নেই। শুধু নোংরা-নোংরা সব কাণ্ডকারখানার কথা। মাছির মতো কেবল আবর্জনায় না বসে মৌমাছি হয়ে একটুক্ষণ ফুলের উপর বস দেখি। তবে বুঝব লেখা একখানা লিখেছিস বটে...!"

কখন নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে রুমকি, বিভাস টের পায়নি।

"আর কতক্ষণ জেগে থাকবে? এবার আলোটা নিভিয়ে দাও। ও-ঘরটাও আলো হয়ে আছে, ঘুম আসছে না একদম।"

"সে তো লিখলে রোজ রাতেই যায়। আগে তো কখনও বলোনি।"

"বলিনি। ইচ্ছে হয়নি তাই।"

হঠাৎ রুমকি ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চেয়ারে বসা বিভাসের কোলের উপর বসে পড়ে। তারপর দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "আজ একটু আদর করবে আমায়?"

"হঠাৎ একথা বলছ?"

"স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হঠাৎ বা সময়-অসময় বলে কিছু আছে?"

কথাটা শেষ করেই রুমকি এক দীর্ঘ গাঢ় চুম্বনে প্রায় হাঁফ ধরিয়ে দেয় বিভাসকে। তারপর বলে, "মাটিতে মাদুর পাতব না ওঘরে বিছানায় যাবে?"

"রুমকি আজ নয়। আর-একদিন প্লিজ।"

"কেন, কেন?" প্রায় পাগলের মতো ওকে ঠেলতে-ঠেলতে পাশের ঘরে বিছানায় নিয়ে যায় রুমকি, "তুমি আমাকে একটুও ভালবাসো না। সংসারের জ্বালায় আমার মাথার মধ্যে সবসময় কেমন করে। একা-একা আমার উপরে সব ছেড়ে দিয়ে তুমি বেশ মজায় আছো, না?"

"আঃ, রুমকি আস্তে। মেয়েটা জেগে যাবে। মা ও-ঘরে ঘুমোচ্ছে। কী হয়েছে তোমার আজ বলো তো?"

"আমার কিছু হয়নি। কিছু হয়নি আমার। আমি তোমার স্ত্রী। তোমার কাছে আদর চাইব এটাই তো স্বাভাবিক। এসো..."

Be familiar with www.banglatorrents.com

"রুমকি, সোনা আজ আমি তৈরি নই। কিছু যদি হয়ে যায়?"

অন্ধকারে এই ভূতগ্রস্ত নারীটির মুখ দেখা যাচ্ছে না আর। সংসারের ঝামেলাতে জীর্ণ শরীর ওর। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে। তার এই শরীরের স্পর্শে কিছুতেই তরঙ্গায়িত হয় না বিভাসের কামনা।

সে তখন মনে-মনে দময়ন্তীর মুখটা মনে করবার চেষ্টা করে। মনেও পড়ে স্পষ্ট। ধীরে-ধীরে উত্তেজিত হয়ে ওঠে সে। বিলাসপুরে দময়ন্তীর কাছে কবে যাওয়া যায়, ভাবতে-ভাবতে সে গভীর বাহুপাশে আবদ্ধ করে তার তৃষ্ণার্ত স্ত্রীর কামতপ্ত শরীর। আর এই সহবাসের ক্ষণস্থায়ী সুখটুকু যেন নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় রুমকি। আবেগে আবেশে তার দু' চোখ বেয়ে নামে অঝোর জলের ধারা।

## আ নীলা ঘোড়া কা অসোয়ার

গতকাল দিল্লি থেকে কলকাতা অভিমুখী একটি বিমান অবতরণের সময় অল্পের জন্য বড় রকমের এক দুর্ঘটনা হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে। এই খবরটা কলকাতার প্রায় সব দৈনিকেই ছাপা হয়েছে। ঋষভ প্রতিদিন খুব সকালে নিয়মিত একটি জিমে এক ঘণ্টা কাটিয়ে আসে। তারপর এসে তৈরি হয়ে অফিসে যায়। আজও জিম থেকেই ফিরছিল সে। গাড়িতে উঠতেই সুখলাল তাকে দেখাল খবরটা।

বাংলা ছাড়া আর একটি ইংরেজি দৈনিকও রয়েছে গাড়িতে। ঋষভের দেওয়া দু' লাইনের একটি বিবৃতিও দেওয়া হয়েছে তার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে। কাল অফিসে আসার পর-পরই খবরটা কীভাবে তার পরিচিত মহলে চাউর হয়ে যায়। সব ফোন বা মেসেজ অবশ্য সে নিজে রিসিভ করেনি। সেগুলি সামলেছে তার সেক্রেটারি ঐশী চট্টোপাধ্যায়। পুষ্পস্তবকে অফিসের রিসেপশনের টেবিলটি প্রায় ভরে গিয়েছিল। শুধু কোম্পানির চেয়ারম্যান আর অন্যান্য ডিরেক্টরদের ফোন ঋষভকেই ধরতে হয়েছিল। আর সংবাদপত্রের লোকদেরও সে চটায়নি। এই কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে টিকে থাকতে হলে মিডিয়াকে হাতে রাখতেই হয়। ঋষভ সেটা ভালই জানে।

এই কোম্পানিতে সে এসেছিল প্রায় বছর সাত-আট আগে। এদের সাপ্লাই চেন ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব নিয়ে। তারপর এই ক'বছরে দ্রুত উঁচু মহলের নেকনজরে পড়ে যাওয়া আর ধাপে-ধাপে বা কখনও ডবল প্রমোশনের সুবাদে আজ সে কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। বোর্ডের সদস্যদের প্রধান। কনস্যুমার প্রোডাক্টে তাদের কোম্পানি রাজ্যে বেশ একটা পাকা জায়গা করে নিয়েছে। এখন সে আধুনিক কর্পোরেট জগতের একজন নক্ষত্র বিশেষ। নিজের পজিশনটা ঋষভ উপভোগ করে পুরোমাত্রায়।

গতকাল বিকেলের চেম্বার অফ কমার্সের মিটিং-এ সে ছিল মধ্যমণি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিমন্ত্রী যিনি এসেছিলেন, তিনি ঋষভের কাজ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবগত এবং উৎসাহী। ঋষভের কোম্পানি নয়ডায় একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার করতে যাচ্ছে শুনে তিনি সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আইনি সূত্রের নানা জট ছাড়িয়ে প্রজেক্টটা নামাতে যে এবার আর মোটেই বেগ পেতে হবে না, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

অফিসে ঢুকতে-ঢুকতে ঋষভের রোজ প্রায় বেলা সাড়ে দশটা বেজে যায়। অফিস শুরু হয় অবশ্য সাড়ে ন'টায়। তার আসার খবরে সবাই যে-যার চেয়ারে নড়েচড়ে বসে। এসেই কাকে তলব করবেন বস কেউ জানে না। তাদের এই অফিসটা ক্যামাক স্ট্রিটের একটা বহুতল বিল্ডিংয়ের সাততলা থেকে বারোতলা পর্যন্ত। ঋষভ বসে বারোতলায়। বিশাল ঘরের কাচের স্ক্রিন দিয়ে একটু দূরের ময়দানের সবুজ ঘাস দেখা যায়। দেখা যায় শহিদ মিনার, হাওড়া ব্রিজ আর অসংখ্য কংক্রিটের উঁচু-নিচু ঘরবাড়ি। ঋষভ অবশ্য এসব কিছুই দেখে না। বর্ষাস্নাত কলকাতা, শরতের আলো-ঝলমলে জনপদ অথবা গ্রীষ্মের লোডশেডিং বারো তলার কাচের জানালায় নখ আঁচড়ায় না।

রোজই অনেকগুলি ই-মেল জমে থাকে ঋষভের কম্পিউটারে। সই করার জন্য থাকে অঢেল কাগজ। রিসেপশনে অপেক্ষা করে থাকে তার অধস্তন অফিসাররা। ঋষভের পরামর্শ, মতামত বা অনুমোদন ছাড়া তারা কাজে এগোতে পারে না। আর মিটিং এবং ফোনকলের হিড়িকে ঋষভকে পাওয়া প্রায় অমাবস্যার চাঁদকে পাওয়ার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া আছে বিজনেস লাঞ্চে যাওয়া। বিশেষ অতিথিদের বাইরে নিয়ে গিয়ে ট্রিট দিতে হয়। রাত আটটা পর্যন্ত অফিসে সে থাকে। কখনো আরও বেশিক্ষণ।

এরপর ক্লাবে যাওয়া, সেটাও ব্যবসারই স্বার্থে। কলকাতার নামী তিনটি ক্লাবের লাইফ মেম্বারশিপ আছে কোম্পানি থেকে। বিজনেস ওয়ার্ল্ডের লোকজনদের সঙ্গে নিয়মিত একটা যোগাযোগ রাখার কেন্দ্রস্থল এই ক্লাবগুলো। এছাড়া বিভিন্ন মিটিং তো লেগেই আছে।

আজ অফিসের পর যে-ক্লাবটায় ঋষভ এসেছে, সেখানে গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটা বড় ধরনের পার্টি হচ্ছে বোধহয়। মুম্বই-এর একটা ছোটখাটো গ্রুপ তাদের বিজনেস লঞ্চ করেছে এখানে, সেই উপলক্ষে পার্টি। ফিনানশিয়াল কোম্পানি। ঋষভের এরিয়া নয়।

তবুও এদের অনেকেই তাকে চিনবে। তাই তাড়াতাড়ি লিফটে উঠে এল ঋষভ। এক পেগ হুইস্কি সার্ভ করে গেল তার চেনা ওয়েটারটি। সঙ্গে বরফ আর কাজু বাদামের প্লেট।

আজ একলা ড্রিঙ্ক করবে ঋষভ। নয়ডার প্রজেক্টটা আগামী চার-পাঁচ বছরে সেবা গ্রুপের টোটাল ইনকাম অন্তত ফিফটি পার্সেন্ট বাড়িয়ে দেবেই। ফরেন টেকনিসিয়ানদের জন্য রয়্যালটি বাবদ একটা মোটা অঙ্কের টাকা অবশ্য বিদেশে চলে যাবে প্রতি বছর। তবে সে-চুক্তিটা মাত্র পাঁচ বছরের জন্য। একটু ভাবতে হবে। পানীয়ের সঙ্গে ভাবনাটা জমে ভাল। ধাক্কা খায় না।

"হাই ঋষভ।"

"হাই নারায়ণদা। হাউ ডু ইউ ডু?"

"বসতে পারি?"

"মাই প্লেজার। শিওর..."

সামনের চেয়ারটা টেনে বসে পড়লেন আর এন্টারপ্রাইজের এম ডি নারায়ণ দত্ত রায়। বিশাল দশাসই চেহারা। ওঁর ভুঁড়ির ঠেলায় টেবিলটা নড়ে উঠল যেন একটু।

নারায়ণের হাতে ধরা গেলাস। ঋষভের নির্দেশে ওঁর পানীয়ের বোতল এবং অনুপানগুলো বেয়ারা ঋষভের টেবিলে এনে রেখে দিয়ে গেল।

"শুনলাম কাল একটা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে তুমি নাকি ন্যারোলি এসকেপ্‌ড! কী হয়েছিল ঠিক ঘটনাটা? আমার মেসেজটা পেয়েছিলে নিশ্চয়ই?"

"পেয়েছি। থ্যাঙ্কস। আর বলবেন না, সে এক অকোয়ার্ড এক্সপিরিয়েন্স। আধঘণ্টা সে যে কী অবস্থা, কী বলব..."

নারায়ণদা বিয়ারে চুমুক দিতে-দিতে সব শুনলেন ঘটনাটা। ওঁর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠছিল মাঝে-মাঝে। একটা মেরুন রঙের টি-শার্ট আর কলপ দেওয়া চুলের জন্য নারায়ণদাকে একটু দুষ্টু-দুষ্টু লাগছে। বাড়ি হয়ে এখানে এসেছেন বোঝা যাচ্ছে। এবং কোনও মতলবেই এসেছেন নিশ্চয়ই। তবে সেটা ব্যবসা সংক্রান্ত নয়। নারায়ণদা হলেন ইজি গোয়িং ম্যান। নেশাটেশা আর ফূর্তি-টুর্তি নিয়ে থাকতেই ভালবাসেন।

ঋষভের অনুমান ঠিক। খানিকটা এলোমেলো গল্প করার পর হঠাৎ চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নারায়ণদা নিচু স্বরে বললেন, "হাতে সময় আছে ঋষভ?"

"কেন বলুন তো?"

"এক জায়গায় নিয়ে যেতাম তোমায়।"

"কোথায় নারায়ণদা?"

"আগে ভায়া যাবে কিনা বলো, তারপর বলব। একটু কনফিডেনসিয়াল।"

"আমি বুঝেছি, আপনি কী বলতে চাইছেন। কিন্তু আপনি তো আমাকে জানেন, আমি এসব ব্যাপারে..."

"জানি জানি হে ঋষভ। তুমি হলে গুড বয়। শিল্পমহলে তোমার একটা পরিচ্ছন্ন ইমেজ আছে। কিন্তু সে সব হল বউয়ের ভয়ে। এই কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের সব রাঘববোয়ালরাই ঘুষ হিসেবে লাইফটা একটু এভাবে এনজয় করে। কিন্তু তুমি তো তা করছ না। আর ওই যে গতকাল সকালে তোমার জীবনে যা ঘটে গেল, তাতে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, লাইফ কতটা ইনসিকিওরড। তাই জীবনে না হয় এ-রাস্তা ও-রাস্তায় একটু হাঁটলে..."

"সোজা অফিস থেকে এসেছি। আই অ্যাম টায়ার্ড নারায়ণদা।"

"সেজন্যেই তো আরও বলছি। তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি তুমি বেশ টায়ার্ড। তোমার রিল্যাক্সেশনটা এখন খুব জরুরি। তাই বলছিলাম, চলো আমার সঙ্গে। গেলে বুঝবে এটা সেই ট্র্যাডিশনাল জায়গা নয়। ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবেশ। বেশ অ্যাট হোম ফিল করবে। কী, যাবে নাকি?"

একটা দোটানার মধ্যে রয়েছে ঋষভ। কাল থেকে অন্তত বারতিনেক সোমা তাকে ইডিয়ট বাস্টার্ড বলে গালমন্দ করেছে। সোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকাটা এরপরও কি জরুরি?

"আপনি আছেন তো আরও কিছুক্ষণ?" ঋষভ প্রশ্ন করে।

একটা টিসু পেপার দিয়ে ঠোঁট মুছতে-মুছতে নারায়ণদা বলেন, "কেন বলো তো?"

Be familiar with www.banglatorrents.com

ঋষভ গ্লাসে শেষ চুমুকটা দিয়ে বলে, "তাহলে বাড়ি থেকে ফ্রেশ হয়ে তারপর আসতাম।"

নারায়ণদা চোখ মটকে বলেন, "বাড়িতে একবার ঢুকলে বউ টুক করে আঁচলে বেঁধে নেবে। তাছাড়া তোমাকে যেখানে নিয়ে যাব, সেখানে সব রকম ফেসিলিটিই আছে। কোনও অসুবিধে হবে না।"

ঋষভ যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়ে বলে, "সব ফেসিলিটি মানে?"

নারায়ণদা গলা নামিয়ে বলেন, "বললাম না, এ কলকাতার আর পাঁচটা সো কল্ড ব্রথেল বা প্রস কোয়ার্টার নয়। এ হল শোভা দত্তর ফ্ল্যাট। নিরিবিলি রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ায়। গেলেই দেখবে আঁচল দিয়ে শোভা তোমার কপালের ঘাম মুছিয়ে দেবে। এসি চলা সত্ত্বেও হাতপাখা নিয়ে বাতাস দেবে। বাথরুম থেকে হাত-পা ধুয়ে বেরোলে তোয়ালে আর পাটভাঙা পাঞ্জাবি ধুতি বের করে দেবে। ফ্রিজ থেকে বের করে আনবে দামী ওয়াইনের একখানা আস্ত ঠান্ডা বোতল। সাজিয়ে দেবে প্লেটে কাজু বাদাম আর তন্দুরি চিকেন। গল্প করবে তোমার পাশে বসে, ঠিক যেন সাতদিনের বিয়ে করা বউ।"

ওঁর বর্ণনায় হেসে ফেলে ঋষভ বলে, "আপনি ভয়ঙ্কর লোভ দেখাচ্ছেন কিন্তু নারায়ণদা।"

নারায়ণ দত্ত রায় একটু যেন ক্ষুণ্ণ স্বরে বলেন, "তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা, তাই না?"

"না, ঠিক তা নয়। কিন্তু আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে নিতে চাইছেন কেন? আপনি একাই না হয় গেলেন।"

নারায়ণ মাথা হেলিয়ে বলেন, "ও, তুমি ভাবছ বুঝি গ্রুপ সেক্স-টেক্সের কথা বলছি। না না ঋষভ, ওসব কিছুই নয়। শোভা হল আমাদের হৃদয়ের ঊষর মরুভূমিতে একখানি ওয়েসিস। ওখানে কিছুক্ষণ গিয়ে বসলে তোমার মনপ্রাণ ঠান্ডা হবে। তারপর না হয় চলেই আসবে!"

ঋষভ এবার শব্দ করে হেসে বলে, "জায়গাটা কোথায়?"

"সেন্ট্রাল ক্যালকাটায়। রাস্তার নামটা এখনই বলব না।"

"একটা কথা বলব নারায়ণদা?"

"বলে ফেলো দ্বিধা না করে।"

"আপনি কী করে বুঝলেন, আমার হৃদয়ে জ্বালা আছে? আর আপনি যেরকম জোভিয়াল টাইপের এবং সারাক্ষণ হাসিখুশি থাকেন, তাতে তো মনে হয় না আপনারও কোনও জ্বালা-যন্ত্রণা আছে।"

"কী যে বলো! বুদ্ধের সেই বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সর্ষে সংগ্রহ করে আনার গল্পটা জানো না? শোক, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা কোথায় নেই বলতে পার?"

"আপনাকে বেশ আমুদে এবং হালকা চালের লোক বলে মনে করতাম এতদিন। এখন দেখছি আপনি একজন দার্শনিকও বটে।"

"কমপ্লিমেন্টের জন্য ধন্যবাদ। এখন বলো যাবে কি না। আমার সময় হয়েছে এবার।"

"দাদা আজ থাক।"

"কেন?"

"আজ ঠিক মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড নই বোধহয়।"

"এসবের জন্য মেন্টাল প্রিপারেশনের দরকার হয় না। এসব হল গিয়ে ওই ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ের মতো ব্যাপার। স্পার অফ দ্য মোমেন্টে ঘটে যায়। তবে তোমাকে আর জোর করব না। শুধু আমার প্রোপোজালটা মনে রেখো। তারপর যেদিন ইচ্ছে বলবে, আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস।"

"আচ্ছা নারায়ণদা। থ্যাঙ্কস আ লট।"

"ওয়েলকাম।"

এর মধ্যেই বেশ কয়েকটা কেজো ফোন ও এসএমএস এসেছে। কথার ফাঁকে-ফাঁকে সেগুলো এ্যাটেন্ডও করতে হয়েছে। ঋষভের মতো লোকদের ব্যক্তিগত সময় বলে কিছু নেই। সব সময় নিজেকে কোম্পানির চাহিদা দাবিদাওয়া প্রত্যাশা আর স্ট্র্যাটেজির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হয়। একবারের জন্যও থামা বা বিরতির কোনও ব্যাপার নেই। দিনের লাঞ্চটাও কোম্পানির কাজ বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত। পোশাক-আসাকও সেইভাবে পরতে হয়।

তবু কোনওরকম ক্লান্তি আসে না তার। বিরক্তিও আসে না। নিজের কাজের চেষ্টার আর পরিশ্রমের অক্লান্ত ফল ফলতে দেখলে বরং উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। কর্পোরেট ওয়র্ল্ডের স্ট্র্যাটেজি হল, নিজেকে সকলের উপরে তোলা, দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। আর সেই সঙ্গে লোক দেখানো কিছু সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পালন। যেটা হল গুডউইল। বাজারে চিহ্নিত হওয়া। ঋষভ আপাতত এইসবই বোঝে। ফ্যামিলি ম্যাটার্স নিয়ে সোমার যথেষ্ট অনুযোগ বিরক্তি ও উষ্মাকে সে তত পাত্তা দিতে চায় না।

ক্লাবের এই বারটা এতক্ষণে বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। নারায়ণদা দত্ত রায় চলে গিয়েছেন। সিগারেটের ধোঁয়া আর উচ্চকিত ঘরটা এখন প্রাণবন্ত।

এইবার ঋষভও উঠবে। রাত পৌনে দশটা। এখানে সকলেই প্রায় তার চেনামুখ। অনেকেই এগিয়ে এসে অভিবাদন জানাচ্ছে। একটু গায়ে পড়তেও চাইছে কেউ-কেউ। গতকালের দুর্ঘটনার ব্যাপারটা নিয়ে বিশদ জানতে চাইছে। অদূরে মৃদুস্বরে মিউজিক বাজছে। বার কাউন্টারে উঁচু চেয়ারে বসে আছে কয়েকজন। ক্লাব ঘরের নরম নানাবর্ণের আলোয় একটা মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখছে কেউ, কেউ বা কোণের বড় পিয়ানোটায় টুং-টাং শব্দ তুলছে এলোমেলো আনাড়ি হাতে। লবির ওপাশে বিলিয়ার্ড রুমে সিলিং থেকে ঝোলা মস্ত বড় আলোর নীচে দাঁড়িয়ে লক্ষ্যে পৌঁছনোর চেষ্টায় মগ্ন, বিলিয়ার্ড স্টিক হাতে কয়েকজন পুরুষ।

"স্যার, ডিনার করবেন তো?" একজন স্টুয়ার্ড এসে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়ায়।

"না, বিল দিয়ে দিন।"

"পাঠিয়ে দিচ্ছি স্যার। আ মোমেন্ট প্লিজ।"

পরপর কয়েকটা হিন্দি সিরিয়াল, ইংরেজি, বাংলা দু'-একটা সিনেমা ম্যাগাজিন আর বেশ কয়েকটা টেলিফোন কল। সন্ধের পর থেকে রাত প্রায় দশটা-সাড়ে দশটা পর্যন্ত সাধারণত এইসব নিয়েই থাকে সোমা। আর কিছু করার নেই। মাঝে মাঝে গেস্ট অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা আসে।

ঋষভ বাড়ি ফেরে রাত দশটা নাগাদ। প্রথম-প্রথম এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে খুব অশান্তি হত। চিৎকার, চেঁচামেচি, চাপানউতোর। এখন ধীরে-ধীরে সব গা সওয়া হয়ে গেছে সোমার। কিছু বলে না, প্রশ্নও করে না। ঋষভ বাড়ি ফিরলে গম্ভীর মুখে ডিনার টেবিলে এসে বসে। কথাবার্তা টুকটাক হয়। কাজের লোক বলতে একজন কুক, চারজন বেয়ারা আর দু'জন ঘরদোর বাসনপত্র সাফসুফ করার জন্য। রাত দশটায় এরা নীচে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে চলে যায়। পার্টি ইত্যাদির সময় আরও একটু বেশি রাত পর্যন্ত থাকে।

দু'জনেই মুখ নিচু করে খেয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ একটু তরল করার জন্য ঋষভ বলে ওঠে, "তোমার ডায়মন্ড সেটটা ডেলিভারি দিয়েছে?"

"দিলে তোমায় দেখাতাম না?" সোমা বক্রোক্তি করে।

"সামনের মাসে একটা অফিসিয়াল গেট টুগেদার আছে। তার আগে যদি ওটা আনা যেত..."

"তোমার কি অফিস ছাড়া আর কোনও কথা থাকতে পারে না? গতকাল সকালে ফিরেছ তুমি, তারপর থেকে একবারও ও বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করেছ? তিথি আর অম্বরীশ এসেছিল আজ বিকেলে।"

ও বাড়ি মানে তাদের হিন্দুস্তান পার্কের পৈতৃক বাড়ি। ওখানে এখন ঋষভের বাবা আর মা থাকেন। ঋষভের ছোট বোন তিথি বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে থাকে আমেরিকায়। দু'জনেই পেনসিলভানিয়ার একটা ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত। সম্প্রতি ছুটিতে কলকাতায় এসেছে মাস দু'য়েকের জন্য।

"মা ভাল আছে তো?"

সোমা বিদ্রূপের স্বরে হেসে বলে, "এতক্ষণে মায়ের কথা মনে পড়ল? সত্যি বলিহারি যাই তোমাকে নিয়ে। নিজেকে ঠিক কী ভাবো তুমি বলো তো? একটা কর্পোরেট হাউজের সর্বেসর্বা হয়েছ বলে যেন সকলের মাথা কিনে নিয়েছ। ডিসগাস্টিং!"

"আবার শুরু করলে এইসব?" ঋষভ কাঁটা চামচ প্লেটে নামিয়ে রেখে সিরিয়াস মুখে বলে, "একটা কথা বলব সোমা? আমার কাজকর্ম তোমার যদি এতই অপছন্দ, আমার সঙ্গে থাকতে যখন তোমার এতই অসুবিধা, তখন বিয়েটা শুরুতেই ভেঙে দিলে না কেন?"

"তোমার কাছে তো বিয়ে, স্ত্রী, সংসার, ছেলে-মেয়ে এইসব কিছু নয়। তোমার খালি অফিস আর কাজ। কাজ আর অফিস।"

"তার জন্য সংসারে কি কোনও কিছুর অভাব রেখেছি সোমা?"

"রাখোনি?" সোমা ফুঁসে উঠল, "কতটা সময় দাও তুমি আমার আর জিতের জন্য। শুধু সংসারে একগাদা টাকা ঢাললেই বুঝি সব দায়িত্ব শেষ? বিজয়দা তো দিদিকে নিয়ে প্রতিবছর কত জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। আর ওদের বন্ধু মৌসুমিদি বছরে দু'বার পার্থদাকে নিয়ে মেয়ে-জামাইয়ের কাছে আমেরিকায় যায়। আর তুমি?"

"তুমি কি আজকেও পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করবে সোমা?"

"আমি তো কিছু বলিনি। চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিলাম। শুরু করলে তুমিই।"

"ও শিট। ভাল কথাও দেখছি তোমার সঙ্গে বলা যাবে না।"

"না যাবে না," সোমা প্রায় চিৎকার করে ওঠে, "যাবে না। এখন সামনে অনেক খরচ, অনেক দুশ্চিন্তা আসছে। হিরের নেকলেসের কথা তোমার মুখে শুনতে একদম ভাল লাগছে না।"

ঋষভের মুখটা শুকিয়ে যায়। "কেন কী হয়েছে? কারও কী...?"

সোমা মাথা নিচু করে শান্ত স্বরে বলে, "খাওয়া শেষ করে নাও, বলছি।"

ঋষভ এবার ভাল করে লক্ষ করে দেখল সোমা খুব সামান্য একটুখানি


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

ভাত আর এক টুকরো চিকেন নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করছে। ঋষভের বুকটা ধক করে ওঠে। কার কী হল আবার?

সোমা উঠে ফ্রিজ থেকে এক হাঁড়ি ঠান্ডা দই বের করে এনে নিজের জন্য একটু নিয়ে বলে, "তোমাকেও একটু দিই?"

"না আমার খুব টেনশন হচ্ছে। আগে বলো কী হয়েছে?"

"দইটা মুখে দাও একটু, তারপর বলছি।"

ড্রইংরুমের ছোট আলো মাত্র দু'-একটা জ্বলছে। খাবার ঘরের সিলিং থেকে ঝুলছে সুদৃশ্য কাচের বাতি। এই আলো-আঁধারিতে বিশাল ঘরটি রহস্যময় হয়ে ওঠার কথা। প্রায় সাড়ে তিন হাজার স্কোয়্যার ফিটের এই ফ্ল্যাট সুদৃশ্য বিলাসবহুল আসবাব আর জিনিসপত্রে ভর্তি। মার্বেল ফ্লোরিং-এর অনেকটাই মহার্ঘ মূল্যবান কার্পেট দিয়ে ঢাকা। বেডরুম, ব্যালকনি আর পর্দা থেকে শুরু করে ডোর বেলের পিয়ানোর মতো ছন্দোময় আওয়াজে পর্যন্ত রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম আর প্রাচুর্যের নিদর্শন। রয়েছে বশংবদ খানসামা, রাঁধুনি, পরিচারক, পরিচারিকা।

সোমা টেবিলের দিকে তাকিয়েই বলে, "তিথি আর অম্বরীশ মায়ের ব্লাড রিপোর্টগুলো নিয়ে এসেছিল। ওঁর লিভার ক্যানসার ধরা পড়েছে।"

"ও গড। আমাকে একটা ফোন করলে না?"

"ফোন করলে তুমি ধরতে?"

"নিশ্চয়ই ধরতাম। ওরা কখন এসেছিল?"

"বললাম তো আগে, বিকেলে।"

খেয়ে উঠে ড্রইংরুমে বসে সোমা রিপোর্টগুলো সব দেখায় ঋষভকে। সে আজ ভীষণ দুঃখিত। শাশুড়ি-মাকে সে বিয়ের পর থেকেই ভালবেসে এসেছে। কারণ শাশুড়ি-বউয়ের সম্পর্ক নিয়ে তার যা ধারণা ছিল, সেটা একেবারেই খাটেনি তার জীবনে। শ্বশুর, শাশুড়ি দু'জনেই বউমা অন্ত প্রাণ।

শ্বশুরমশাই সুকুমার মিত্র কলকাতার হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস হয়ে রিটায়ার করেছেন বেশ কয়েক বছর হল। শাশুড়ি অনুভা সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনস্কা। সমাজসেবিকা হিসেবেও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আর সোমাকেও বিয়ের পরপরই একটা এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। সোমা এই সংস্থাটির গভর্নিং বডিতে ছিল অনেকদিন। গত বছর ইউটেরাস অপারেশনের পর থেকে কোমরে একটা ব্যথা শুরু হওয়ায় আর নিয়মিত হরমোনের ওষুধ খেতে হয় বলে বিশ্রামের জন্য বাড়িতেই থাকে।

অনুভা নানা উপসর্গে ভুগছিলেন বেশ কিছুদিন। ওজন কমে যাওয়া, পেটে ব্যথা, গ্যাস অম্বল ইত্যাদি। ডাক্তার দেখাতেন না, নিজের চিকিৎসা নিজেই করতেন। শেষে মেয়ে-জামাই এসে জোর করে এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। কয়েকটা টেস্ট করতে বলেন ডাক্তার। এখন রিপোর্টে ধরা পড়েছে ক্যানসার। এবং রোগটা নাকি বেশ ছড়িয়ে গেছে।

সোমা জানায়, মাকে তো নয়ই, বাবাকেও বলা হয়েছে, মায়ের সিরিয়াস জন্ডিস হয়েছে। আরও কয়েকটা টেস্ট করলে তবে ঠিকঠাক বলা যাবে।

সব কথা বলার পর সোমা বলে, "অম্বরীশকে ফোন করবে না তুমি?"

"হ্যাঁ, এখনই করব।"

"আমি বলি কী, কাল তুমি একবার সল্টলেক যাও। আমিও তোমার সঙ্গে যাব। মা'র চিকিৎসার ব্যাপারে একটা প্ল্যান করা দরকার। এরপর তিথিরা আমেরিকায় ফিরে যাবে, আর তুমিও কাজের দোহাই দিয়ে মাকে দেখবে না। নাও ফোনটা করে নাও। ও, দুটো ফোনও এসেছিল তোমার আজ।"

"কোথা থেকে?"

"চিনি না, নাম বলল বিভাস হালদার। তোমার নাকি ছোটবেলার বন্ধু!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিভাস ফোন করেছিল? ও নাকি একজন নামকরা লেখক।"

সোমা সবিস্ময়ে বলে, "এ কি সেই বিভাস হালদার? খুব ভাল লেখেন উনি। এই প্রজন্মের নামকরা লেখক। উনি তোমার বন্ধু? কই কখনও তো ওঁর কথা বলোনি! জানালে একদিন বাড়িতে ডাকতাম। অটোগ্রাফ নিতাম ওঁর।"

ঋষভ সোমার মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকে। গতকালের ভয়ানক যাত্রার কথা সে সবিস্তার বলেছে সোমাকে। কিন্তু বন্ধু বিভাসের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাটা বলেনি। মনে হয়েছিল, কে এক হেঁজিপেঁজি লেখক! সামাজিক স্টেটাসেও মেলে না তার সঙ্গে। ফোন নম্বর অবশ্য দিতেই হয়েছিল। কিন্তু এর বেশি আর ঘনিষ্ঠতা করার ইচ্ছে তার ছিল না। এখন দেখছে সোমাও তাকে মাথায় তুলতে চায়।

কথা ঘোরাবার জন্য ঋষভ বলে, "আর কার ফোন এসেছিল?"

"তোমাদের চেয়ারম্যান অরবিন্দ রায় সাহেব।"

"চেয়ারম্যান? হঠাৎ বাড়িতে ফোন!" এক লাফে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ঋষভ। দৌড়ে ফোনের দিকে এগিয়ে যায়। সোমা বাধা দিতে গিয়েও থমকে যায়। বলতে পারে না, এখন রাত প্রায় বারোটা, আর উনি রাত দশটার পর কখনও ফোন ধরেন না। সোমা নীরবে দেখে যায় একজন মানুষকে, যে শুধু ছুটছে আর ছুটছে। অবিরাম ছুটছে।

জনপদ ছাড়িয়ে, পর্বত পার হয়ে, অরণ্যের ঝরাপাতা পায়ের নীচে রেখে একটা লোক শুধু ছুটছে ঘোড়ার পিঠে। নীল রঙের সেই ছুটন্ত ঘোড়া তাকে নিয়ে দুরন্তবেগে ছুটে চলেছে। ছুটেই চলেছে। পিছনে পড়ে আছে তার স্বজন, তার বন্ধুবান্ধব, তার সম্পদ, তার শুভাকাঙ্ক্ষী কত মানুষ। সে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না একবারও। তার ছুটন্ত নীল অবয়ব শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে যে থামবে, কে জানে।

সেই বিয়ের পর থেকে মানুষটা অধরাই থেকে গেল সোমার কাছে।

**ঘুঙুর তোমার একলা বাজুক**

এই বছরের পুজোসংখ্যার উপন্যাসের প্লটটা বেশ কয়েকদিন ধরেই মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু বিভাসের সমস্যা হল, শুরুর প্রথম লাইনটা কলমের ডগায় না আসা পর্যন্ত লেখাটা সে ধরতেই পারে না। বস্তুত, সেরকম জুতসই কোনও লাইন কিছুতেই মনে আসছিল না তার। হঠাৎ, হঠাৎই আজ ভোরের দিকে আচম্বিতে কতগুলো অসংলগ্ন শব্দ যেন খোঁচা দিয়ে তার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল। তারপর নৃত্যের ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করতে-করতে অবশেষে একটা রূপও নিয়ে নিল।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল বিভাস। স্বপ্নলব্ধ সেই লাইনক'টি লিখে ফেলল ঘোরের মধ্যে। তারপর পাতাটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

হাতের আড় ভেঙে গেছে এইবার। তন্ময় হয়ে বেশ কয়েক পৃষ্ঠা লিখেও ফেলল সে।

লেখার সময় সত্যি যে তার বাহ্যজ্ঞান থাকে না, সেটা সে আজও অনুভব করল যখন পিছন থেকে রুমকি এসে ডাকল, "এই, বাজারে যাবে না?"

বিভাস ভীষণ চমকে উঠে বলে, "কী হয়েছে? ও, তুমি? তাই বলো..."

"এই থলি রেখে গেলাম। ফর্দ মা'র কাছে আছে। নিয়ে তবে যেও। আমি স্নানে গেলাম।"

বিভাস প্রস্থানোদ্যত রুমকির দিকে তাকিয়ে বলে, "আজ বাজারে না গেলেই নয়? পুজোর লেখাটা ধরেছিলাম। এই সপ্তাহে কম করে দশ-বিশ স্লিপ লিখে ফেলতেই হবে। তবে সময়মতো জমা দিতে পারব। হঠাৎ চাইলে আমি পারি না, তা তো জানোই..."

"সারাদিন টো-টো করে ঘুরে আড্ডা দিয়ে না বেড়িয়ে, বসে-বসে লিখলেই তো পার। যত কোপ সব বাজারের ওপর?"

বিভাস মনের বিরক্তি ভাবটা গোপন করে লেখার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। বাজারের থলি হাতে নিয়ে বলল, "আড্ডা মারাটা লেখার পক্ষে খুবই জরুরি। তোমরা সেটা বুঝবে না। ওতে অনেকরকম রসদ পাওয়া যায়।"

রুমকি বলল, "এবারের লেখার টাকা যা আসবে তা সংসারে ঢালার দরকার নেই। ওদিকটা আমি স্কুলের মাইনে দিয়ে সামলে নেব। তুমি বরং প্লিজ একটু বেশি টাকার ব্যবস্থা কর। নইলে ভদ্রেশ্বরের অত সস্তার জমিটা শেষে হাতছাড়া হয়ে যাবে।"

বিভাস বলল, "সত্যি বলতে কী, ভদ্রেশ্বরে যেতে আমার মন চাইছে না। টাকা যদি জোগাড় হয় তবে চলো, অন্য কোনও জায়গা দেখা যাক। কাছেই বিরাটি কিংবা মধ্যমগ্রাম।"

রুমকি বিভাসকে থামিয়ে দিয়ে বলে, "আহা আপাতত একটা জমি কিনেই রাখা যাক না! জমির দাম তো বাড়ছেই কেবল। সেরকম পার্টি পেলে না হয় ছেড়ে দেব। কিন্তু এ-বাড়িতে আমার আর একটুও মন টিকছে না। যাই, আমার স্কুলের ওদিকে দেরি হয়ে গেল বোধহয়..."

বিভাস চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে একসার কালো পিঁপড়ে একটা মরা আরশোলাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। খুব কষ্টকর, খুবই আয়াসসাধ্য কাজ, তবু ধীরে-ধীরে ওরা চলছে। চলছে। সকলে একসঙ্গে।

জীবনটাও ঠিক এরকমই আয়াসসাধ্য। এখানেও একা চলা যায় না। তবু চলতে হয়। এবং শেষ পর্যন্ত হয়ে যেতে হয় একাই। এই যা তফাত।

মা'র কাছ ছেকে ফর্দটা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে নিল বিভাস। লেখায় ছন্দপতন ঘটেছে। তাল কেটে গিয়েছে একেবারে। আজ রাতের আগে আর লেখাটা নিয়ে বসা যাবে না।

প্যান্টের পকেটে মোবাইলটা গোঙাচ্ছে। একটা অচেনা নম্বর।



Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

"হ্যালো, কে?"

"বিভাস হালদার বলছেন কি?" ও-প্রান্তে নম্র নারী-কণ্ঠস্বর।

"হ্যাঁ বলছি। কিন্তু আপনি..."

"আমি আপনার বন্ধু ঋষভ মিত্রের স্ত্রী বলছি। সোমা মিত্র। গত সপ্তাহে ফোন করলেন আমাদের বাড়িতে, অথচ আপনার পরিচয়টাই দিলেন না। জানেন, আমি আপনার একজন গ্রেট অ্যাডমায়ারার। আপনার লেখা দেখলেই পড়ে ফেলি।"

বিভাস আড়চোখে চেয়ে দেখল মা রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে ওদের ফোনের কথাবার্তা ঠাহর করার চেষ্টা করছেন। সোমা বেশ জোরে-জোরেই কথা বলছেন। বোঝা যাচ্ছে, উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না। তার মানে ঋষভের ঠিক উল্টো। ওর মত রসকসহীন মানুষ নয়। লেখকদের কদর করে।

ঘরের মধ্যে এসে বিভাস গলা একটু তুলে বলে, "সেটা আমার সৌভাগ্য। ঋষভকে আমার কথা বলেছিলেন কি?"

"ওমা! বলিনি আবার? ও রবিবার ফ্রি থাকে। চলে আসুন না আমাদের বাড়ি। এলে অটোগ্রাফ দিতে হবে কিন্তু।"

"বেশ। আমার সাম্প্রতিক একটা উপন্যাসের কপিতে না হয় সই দেব।"

"রিয়্যালি? আচ্ছা ওইদিন যদি আমার কয়েকজন বান্ধবীকে ডাকি নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না। আপনার 'রঙিন ফানুস' উপন্যাসটা নিয়ে সকলের মনে নানা প্রশ্ন, কৌতূহল, বুঝলেন। আচ্ছা, বিদিশা চরিত্রটা কীভাবে সৃষ্টি করলেন বলুন তো। ওরকম কাউকে দেখেছেন বুঝি আগে?"

পাঠক-পাঠিকাদের এইসব আদেখলাপনার জবাবে যে আহ্লাদে একেবারে গলে যেতে নেই, সেটা বিভাস এই কয়েক বছরে ভালরকম রপ্ত করে নিয়েছে। একটা দূরত্ব সবসময় বজায় রাখতেই হয়। তাই সে এসব কথায় তেমন পাত্তা না দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে ওঠে, "ওরকমই কিছু ধরে নিতে পারেন। ঋষভ বাড়িতে নেই? ওকে দিন না..."

"আসলে, আজ কিছুদিন হল আমার শাশুড়ির শরীরটা খুব খারাপ। তাই ওখানে গিয়েছে। তবে সামনের রবিবার বিকেলে ও নিশ্চয়ই বাড়ি থাকবে। আপনি সন্ধেবেলা আসবেন কিন্তু। ঠিকানাটা লিখে নেবেন কি?"

"না, ঋষভের একটা কার্ড আছে আমার কাছে।"

"সকালবেলা এসময়ে ফোন করে আপনাকে ডিসটার্ব করলাম, প্লিজ কিছু মনে করবেন না। লিখছিলেন বোধহয়?"

"না, না আমি কিছু মনে করিনি। ছাড়ছি এখন তা হলে। নমস্কার।"

সোমা মিত্রকে বলল বটে যাওয়ার কথা, কিন্তু সামনের রবিবার বিভাস কলকাতায় থাকবে কি না তার ঠিক নেই। সেই দিল্লি থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত দময়ন্তী তাকে খুব টানছে, বিলাসপুরে খুব তাড়াতাড়ি একবার না গেলেই নয়।

দময়ন্তীর সঙ্গে প্রথম আলাপ একটি সিনেমায়। একটা বাংলা ছবি দেখতে গিয়ে। টিকিট কেটেছিল অলকেন্দু। আর ফোন করে বলেছিল, "সাড়ে তিনটেয় রবীন্দ্রসদনের কাছে চলে আসিস বিভাস। একটা দারুণ ছবি দেখাব। আর সেই সঙ্গে আছে একটা মস্ত সারপ্রাইজ।"

"সারপ্রাইজ!"

"হ্যাঁ, রীতিমতো স্পেলবাউন্ড হয়ে যাবি শালা।"

অলকের সব সারপ্রাইজ-ই যে নারীঘটিত, সেটা সেই কলেজ লাইফের পর থেকে বিভাস ও তার অন্যান্য বন্ধুদের জানা হয়ে গেছে। তবে দময়ন্তী নামের এই বিশেষ নারীটি যে সব সারপ্রাইজের শীর্ষে, সেটা বোঝা গেল ওকে সামনে দেখে। এবং অবশ্যই সামান্য একটু আলাপ করেই। বাংলা আর ইংরেজীতে এম এ করেছে। ডস্টয়েভস্কি, কাফকা, নুট হামসুন, বোদলেয়র এবং রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য থেকে অনায়াস রেফারেন্স তার কথাবার্তায়। আরও একটু বেশি আলাপের পর বিভাসের মনে হয়েছিল দময়ন্তীর ডাকসাইটে সৌন্দর্যকেও ম্লান করে দিয়েছে ওর সতেজতা ও মেধা। অলকেন্দুটা এতদিনে সত্যি বাগিয়েছে বটে একজনকে।

ইন্টারভালে সিগারেট খেতে বাইরের লবিতে এসে দাঁড়াতেই অলকেন্দু ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, কেমন লাগছে?"

"ছবিটার কথা বলছিস?"

"দূর বে! দময়ন্তীকে কেমন লাগছে?"

"আমার ভাল লাগলে কী যায় আসে রে, তুই শালা আগেভাগেই বুক করে নিয়েছিস ওকে..."

"সো হোয়াট? ভাল লাগলেই তাকে বুক করতে হবে? শোন, তোকে এখন দুটো খবর দিই, দুটোই খুব সেনসেশনাল। এক নম্বর হল, সামনের মাসেই আমি আর দময়ন্তী রেজিস্ট্রি করছি। ইট্‌স ফাইনাল। আর দ্বিতীয় খবরটা হল তোকে নিয়ে।"

"আমাকে নিয়ে?"

"ইয়েস। দময়ন্তী তোর সবক'টা লেখার উপর একটা প্রবন্ধ লিখছে। বলা যায়, তোর লেখার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন। আর সেটা ছাপা হবে খুব শীঘ্রই। ও যে বিভিন্ন ম্যাগাজিনে লিখছে ইদানীং, সে খবর তো রাখিস দেখলাম।"

"কই, এ-ব্যাপারে ও আমাকে কোনও হিন্ট্‌স দিল না তো। আর তুইও তো দময়ন্তীর সঙ্গে আলাপের ব্যাপারটা এতদিন বেমালুম চেপে রেখেছিলি।"

"সরি বিভাস। আসলে ও আমাকে বলতে বারণ করেছিল। কিন্তু আমি চেপে রাখতে পারলাম না।"

প্রায় বছর দশেক আগেকার কথা এসব। তখন সবে রুমকি তার বউ হয়ে এসেছে। এবং সেটা ছিল তাদেরও ভালবাসার বিয়ে। তবু দময়ন্তীকে দেখে এবং তার কথাবার্তা শুনে মনে-মনে ওর প্রতি একটা টান অনুভব করেছিল সে সেই প্রায় সেদিন থেকেই। এর ঠিক দু'দিন পরেই একটা চিত্র প্রদর্শনীতে আবার দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। সেদিন দময়ন্তী একাই, কিন্তু বিভাসের সঙ্গে তার দু'-একজন অনুচর ছিল। এরা তার ফ্যান ক্লাব বলা যায়। বিভাসের সাক্ষাৎকার ছাপায় কাগজে, তার বই নিয়ে হইচই তোলে। আর এর বাইরেও কিছু ছেলেমেয়ে আছে, যারা রবিবার বা ছুটির দিন সকালে বাড়িতে এসে বিভাসের তোষামোদ করে। বিভিন্ন পত্রিকায় তাদের নিজেদের লেখা ছাপাবার জন্য সম্পাদকের কাছে বিভাসের সুপারিশ লিখিয়ে নিয়ে যায়। মাঝে-মাঝে নিজেদের লেখা গল্প পড়ে শোনায়, যার অধিকাংশই দুর্বল। তবে এরা গদগদ হয়ে বিভাসের এত প্রশংসা করে, তার লেখা থেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে এত উদ্ধৃতি দেয় যে, এদের একটু ভাল না বেসেও পারা যায় না। আগে চা-বিস্কুট, জলখাবার দিয়ে এদের আপ্যায়ন করত বিভাস। এখন রুমকি আর মা গজগজ করে বলে সেসব বহুদিন বন্ধ হয়ে গেছে। তবে ভক্ত ও চাটুকাররা এবং নানা সুযোগ-সুপারিশের জন্য অল্পবয়সি ছেলে-ছোকরারা সব সময় তার কাছে ঘোরাফেরা করে। রুমকিকে বউদি বলে ডাকে, মাকে মাসিমা ডেকে অন্তরঙ্গতা পাতিয়ে নিতে চায়।

এরকম দু'জন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে একদিন এই আর্ট গ্যালারিতে এসেছিল সে। দময়ন্তীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায় এবং সে তার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চায় শুনে, ওদের দুজনকে ভাগিয়ে দিয়ে বিভাস তাঁকে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে সটান চলে এল ধর্মতলার একটি রেস্তোরাঁয়।

আর দময়ন্তী এই প্রথম মুখ খুলল তার লেখার ব্যাপারে নিজে থেকেই।

"আপনার এই এত অসাধারণ গদ্য, ঠিক মনে হয় কবিতার মতো। বুদ্ধদেব বসুর কথা মনে পড়ে যায় মাঝে মাঝে।"

বিভাস হেসে বলল, " কিন্তু অনেকেই বলে, আমার কোনও অরিজিনালিটি নেই।"

দময়ন্তী মাথা নেড়ে বলে, "তুলনাটা কথার কথা। আপনার গদ্যভঙ্গি যথেষ্ট মৌলিক।"

বিভাস প্রশ্ন করে, "আমায় নিয়ে কী লিখছেন? খুব নিন্দে করেছেন নিশ্চয়ই?"

"তাই বুঝি মনে হচ্ছে আপনার? লেখাটা শেষ হোক। তারপর পড়ে শোনাব আপনাকে। কোন তথ্যের ভুল থাকলে কিন্তু শুধরে দেবেন। লেখাটা লিখতে অবশ্য বেশ সময় লাগছে। কারণ আপনার ওপর এখনও পর্যন্ত কিছু লেখা হয়নি। আপনি এখনও তরুণ প্রজন্মের একজন।"

ওর সামনে বসে আছে একজন অসাধারণ সুন্দরী মহিলা। শুধু বসে আছে নয়, তার লেখার প্রশংসা করে যাচ্ছে। এর চেয়ে সুন্দর মুহূর্ত আর কিছু হয় নাকি জীবনে?

বিভাস জিজ্ঞেস করল, "টাইটেল কিছু ঠিক করেছেন?"

"ভেবে রেখেছি একটা আপাতত। বদলাতেও পারি পরে।"

"বলতে আপত্তি না থাকলে বলেই ফেলুন না।"

"নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতায় বিভাস।"

"আপনার অ্যাসেসমেন্টের তারিফ না করে সত্যি পারছি না দময়ন্তী। তবে কী জানেন, আর দুটো বছর আগে আপনার সঙ্গে দেখা হলে আমার লেখার সাবজেক্ট ম্যাটারই হয়তো পাল্টে যেত। বদলে যেত আমার মানসিকতা। তখন হয়তো একাকিত্বটা আর লেখায় আসত না। দময়ন্তী, আপনার মধ্যে একটা জাদু আছে, মায়াজাল আছে যা নিঃসঙ্গতা থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি দেয়।"

দময়ন্তী একটু চুপ করে থেকে বলে, "আপনি হয়তো শুনেছেন অলকেন্দু আর আমি সামনের মাসে..."

বিয়ের কথাটা ওর মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়ার আগেই বিভাস ওকে থামিয়ে দেয়। বলে, "হ্যাঁ শুনেছি। অলকেন্দু সত্যিই ভাগ্যবান।"

"কেন বলুন তো?"

"জানি না। এমনই বললাম। চলুন, এখান থেকে উঠি এবার..."

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ওরা একটি ট্যাক্সি নিয়ে ভিক্টোরিয়া


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

মেমোরিয়ালের সামনের ময়দানটার সবুজ ঘাসে এসে সেদিন বসেছিল অনেকক্ষণ। সন্ধে হয়ে আসছে। মাঠে বল পিটিয়ে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত ছেলেরা ফিরে যাচ্ছে। ছোট্ট টাট্টু ঘোড়ার পিঠে ঘুরছে এখনও দু'-একজন। দূরে লাল আকাশ। সূর্য ম্লান হয়ে আসছে ক্রমে। কালো একসার পাখি উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে।

বিভাসের উঠতে ইচ্ছে করছিল না। দময়ন্তী ওর লেখার ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন করে যাচ্ছিল সেদিন। তাই ওকে থামিয়ে দিয়ে ওঠার কথা ভাবতেই পারছিল না বিভাস।

সে হেসে বলেছিল, "আপনি কি ব্যক্তি বিভাসকেও নিয়ে লিখবেন নাকি দময়ন্তী?"

দময়ন্তী সলজ্জ মুখে উত্তর দিয়েছিল, "আপনার লেখার মধ্যেই ছড়িয়ে আছে আপনার ব্যক্তিসত্তা। আলাদা করে তেমন কিছু জানার দরকার নেই। কৌতূহলবশে কিছু প্রশ্ন করে ফেলেছি হয়তো। অনধিকার চর্চা হয়ে থাকলে মাফ করবেন।"

বিভাস বলেছিল, "সে প্রশ্নই ওঠে না। আপনি যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারেন, যত খুশি।"

কিছু-কিছু কথা আছে যা বিশেষ কোনও একজনকে বলার সময় বুকটা ভারী হয়ে ওঠে। কণ্ঠস্বর বদলে যায়। বাতাস যেন এক অজানা নির্যাস তৈরি করে। সৃষ্টি হয় এক অদৃশ্য বলয়। বিভাসের এই কথাগুলি যেন সেই অভিঘাত সৃষ্টি করল দময়ন্তীর মনে। আর কিছুদিন পরেই দময়ন্তী চলে যাবে অলকেন্দুর ঘরণী হয়ে। ওর সিঁথিতে জ্বলে উঠবে সতর্কীকরণের লাল চিহ্ন। বিভাসের বেপরোয়া গাড়ি থামিয়ে রাখতেই হবে।

কিন্তু থামিয়ে রাখতে পারেনি দময়ন্তী নিজেই। সে বলেছিল, "ওই যে একটু আগে বললেন না অলকেন্দু ভাগ্যবান। হয়তো তাই। কিন্তু আমার কেন যেন নিজেকে মনে হচ্ছে ঠিক উল্টোটা। আমি কি তবে ডিসিশনে ভুল করলাম!"

দময়ন্তী এই কথাগুলোর মাধ্যমে যেন একটা ওপেন টিকিট বিভাসের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল সেদিন। এই প্রশ্নের, এই কথাগুলোর মাঝে লুকিয়ে ছিল অব্যক্ত ভাষা, মায়াবি ইঙ্গিতময়তা। সেই থেকে শুরু হয়ে গেল আলো-ছায়ার খেলা। রেজিস্ট্রির সময় সাক্ষী থাকতে হবে এই অনুরোধ নিয়ে অলকেন্দু যেদিন ওর বাড়িতে এল, সেদিন অলকেন্দুর জন্য আর ঈর্ষা নয়, বরং করুণার উদ্রেক হয়েছিল বিভাসের মনে।

অলকেন্দু অবশ্য তখন নিজেকে নিয়েই মত্ত। "বুঝলি বিভাস, যত দেখছি আর যত জানছি ওকে ততই যেন মনে হচ্ছে..."

"কী মনে হচ্ছে? স্বপ্ন? না কল্পনা?"

"এ বাস্তব। মধুর বাস্তব।"

একসময় অলকেন্দু লিটল ম্যাগাজিনে প্রচুর কবিতা লিখত। তারপর একদিন ওর এক কেউকেটা মামা ওকে কলকাতায় এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির হিউম্যান রিসোর্সে একটা বড়সড় চাকরি জুটিয়ে দেয়। লেখালেখি বন্ধ হয়ে গেল তারপরই। তারপর প্রোমোশন পেয়ে অল্পদিনেই মাঝারি মাপের একজন অফিসার হয়ে গেল সে। দময়ন্তীর সঙ্গে বিয়ের সময়ে সে ছিল একজন সাধারণ কেরানি। তবে ছিল একজন সচেতন কবিতা-প্রেমিক। ধীরে-ধীরে সেই অলকেন্দু বদলে গেল। বদলে গেল তার মানসিকতা।

আর অলকের এই বদলে যাওয়ার ঘূর্ণি হাওয়ায় গোপনে আর-একটি গাছের ডালে অনেক কাছাকাছি উড়ে এসে বসল দু'টি পাখি। বিভাস আর দময়ন্তী। কেউ কাউকে কখনও বলল না সরাসরি। প্রেম নিবেদন করল না। পালিয়ে গেল না কোথাও। শুধু বইতে লাগল বুকের মধ্যে অহর্নিশি এক দামাল বাতাস। শুরু হল হৃদয়ের সংলাপ। আর একই সঙ্গে আরম্ভ হল প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা।

একদিন সেই কাঙ্ক্ষিত ঘটনাই ঘটল। অলকেন্দু দময়ন্তীর বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেল দু'বছরের মধ্যেই। এর মধ্যে বহুবার লুকিয়ে বিভাস আর দময়ন্তী দেখা করেছে। অলকেন্দু ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি কিছু। বিভাসের সঙ্গে দেখা হলে অথবা ফোনে অলকেন্দু কেবলই দময়ন্তীর নিন্দে করে যেত তখন। বলত, "এই মেয়েমানুষের সঙ্গে দিনের পর দিন কাটানো নেক্সট টু ইমপসিব্‌ল। ভারী-ভারী তত্ত্ব ঝাড়লে কি আর সংসার চলে রে শালা? লাইফ হেল হয়ে যাচ্ছে।"

যে-সংসারে অন্য পুরুষের অদৃশ্য ছায়া পড়ে, সেখানে দাম্পত্য শেষ পর্যন্ত সুখের হতে পারে না। এ তো বিভাস তার নিজের লেখাতেও কতবার লিখেছে। কিন্তু সে জানে, সে লেখক হোক আর যা-ই হোক, আসলে সে একজন রক্ত-মাংসের মানুষ। আর মানুষের দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষেও সহজ নয়।

দময়ন্তী চলে গেল অলকের সংসার ছেড়ে। শুধু সংসার নয়, সে ছেড়ে চলে গেল এই কলকাতা শহরও। বিলাসপুরের কাছে এক কোলিয়ারি স্কুলে শিক্ষিকার কাজ নিয়ে। সে কথা জানল একমাত্র বিভাস। দময়ন্তী তার নতুন ঠিকানা দিয়ে গেল শুধু তাকেই।

ঠিকানা দেওয়া মানেই আমন্ত্রণ। আর সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিতে বিভাসকে তাই এখন মাঝে-মাঝেই পালিয়ে যেতে হয় বিলাসপুরে। এই চলছে আজ প্রায় সাত আট-বছর।

সোমা আর ঋষভের বিশাল ফ্ল্যাট আর বিশাল ড্রইংরুম দেখে বিভাস বেশ হকচকিয়ে গিয়েছে। এহেন প্রাসাদোপম বাড়িতে সে আগে কখনও আসেনি। সিলিং থেকে ঝুলছে মস্ত ঝাড়বাতি। দেওয়ালে ছোট-ছোট ফ্রেমে বাঁধানো বিদেশি মূল্যবান পেন্টিং। ঘরের দু'প্রান্তে নরম গদিওলা বিশাল সোফা সেট। মেঝেতে দামী নরম কার্পেট পাতা। এককোণে একটা লম্বা বার ক্যাবিনেট। সেখানে বিদেশি মদের বোতল সাজানো। সোফায় বসতেই একজন বেয়ারা গোছের লোক এক গ্লাস ঠান্ডা সরবত রেখে গেল বিভাসের সামনে কাচের টেবিলে। লোকটার পরনে ধোপদুরস্ত শার্ট আর পাজামা। এইসবের মাঝখানে বিভাসের নিজেকে খুবই সাধারণ, বেখাপ্পা লাগছিল। না এলেই বোধহয় ভাল হত।

ঋষভের স্ত্রী সোমা বেশ সুন্দরী। তবে বড়লোকের গৃহিণীরা যা হয়, বেশ মুটিয়ে গেছে এই বয়সেই। আগে যে সোমা বেশ স্লিম ছিল, সেটা টিভি ক্যাবিনেটের পাশে রাখা মিত্র দম্পতির অল্পবয়সের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি দেখলে ধারণা করে নেওয়া যায়। তার ঠিক পাশেই ওদের বিদেশে পাঠরত একমাত্র ছেলের ছবি। রাজপুত্রের মতো চেহারা। আর ওর নিজের মেয়ে রাই একটা রোগাভোগা দুর্বল শরীরের মেয়ে। মুখশ্রীটুকুই যা সুন্দর।

মনে-মনে এইসব তুলনা করতে-করতে সে যখন বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল, তখনই ঘরে ঢুকল ঋষভ।

"হাই, কেমন আছ বিভাস?"

"এই তো কেটে যাচ্ছে।"

বন্ধুকে নিয়ে পাশে বসিয়ে কথা শুরু করে ঋষভ।

সোমা বলে ওঠে, "ওর সঙ্গে গল্প করে মজা পাবেন না একটুও। সারাক্ষণ অফিসের আর কাজের গল্প করবে। আপনি বরং এইদিকে আসুন। আপনার ভক্তরা এসে পড়ল বলে।"

কিছুক্ষণ পরই ঘরে ঢুকলেন কয়েকজন মহিলা। বিভাস খুশি হল দেখে, ওঁদের মধ্যে দু'জন অল্পবয়সি সুন্দরী যুবতীও রয়েছেন। বিভাসের মনে হল, সে এই সমাজের মহিলা-পুরুষদের নিয়ে এখনও তেমন কিছু লেখেনি। ওটা তার সাবজেক্ট নয়। তবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হওয়াটা মন্দ কী!

ঋষভ বলল, "সময়টা বোধহয় একটু খারাপ যাচ্ছে আমার, বুঝলে বিভাস। এই সেদিন অল্পের জন্য এয়ার ক্র্যাশ থেকে বেঁচে গেলাম। তারপর আমার মায়ের হঠাৎ ক্যানসার ডিটেক্টেড হয়েছে। সেই সঙ্গে অফিসের নানা টেনশন তো আছেই..."

বিভাস বলল, "একই অবস্থা আমারও। প্লেনের ওই ব্যাপারটা বেশ কিছুদিন আমাকেও তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। তারপর এসে দেখি মেয়েটা জ্বরে ভুগছে। আমার স্ত্রী ওকে নিয়ে একলা হিমসিম..."

"আনলেন না কেন আপনার মিসেসকে? এখন মেয়ে ভাল আছে তো?" পাশ থেকে সোমা জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ।"

বিভাসের মনে হল, কী মিষ্টি করেই না কথা বলে এরা সকলে। কী চমৎকার আপ্যায়ন। আর যারা অতিথি এসেছে তারাও। তবে সব ব্যাপারটার মধ্যে একটা মাপা দূরত্ব রয়েছে। বিভাসের তবু ভালো লাগছে এই ভেবে যে, এই অভিজাত উঁচুতলার মানুষরাও তার লেখা পড়ে, তার লেখা ভালবাসে। তার সৃষ্ট চরিত্রগুলো নিয়ে ভাবে। বিভাসের একটু গর্ববোধ হল মনে-মনে। ঋষভটা বুঝুক সে একজন হেঁজিপেঁজি লেখক নয়।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ঋষভ উঠে গেল ড্রইংরুম থেকে। সে অফিসের কিছু জরুরি রিপোর্ট তৈরি করবে। বোর্ড মিটিং এজেন্ডা, প্রপোজাল, কর্পোরেট গভর্নেন্স এইসব শব্দ অনেকবার শুনতে হল তার মুখ থেকে। বিভাসকেও যে এই পদের লোক পাত্তা দিচ্ছে তা-ই কি কম? ঋষভ ততটা না দিলেও সোমা আর তার সহচরীরা তাকে প্রায় ঘিরে ধরেছে। যুবতী মেয়ে দু'জন তার লেখা দু'টি বই এনেছিল। অটোগ্রাফও নিয়েছে।

একজন বলল, "আমাদের কলেজের কয়েকজন মেয়ে না আপনাকে এবং আপনার লেখা নিয়ে রীতিমতো ক্রেজি। আমরাও অবশ্য সেই দলেরই। আপনার লেখা সো সুইট, সো অ্যাবসরবিং।"

বোঝা গেল বিভাসের লেখা মেয়েটি মন দিয়ে আদৌ পড়েনি।

একজন গুরুগম্ভীর মহিলা বললেন, "আচ্ছা, আপনি বিদিশাকে শেষ



Stampy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

পর্যন্ত ওর হাজব্যান্ডের কাছে ফিরিয়ে দিলেন না কেন বলুন তো? এটা কিন্তু ঠিক করেননি।"

বিভাস মৃদু হেসে বলল, "তা তো বলতে পারব না এখন।"

মহিলা যেন একটু আদেশের সুরে বললেন, "সেকেন্ড এডিশনে পারলে সেটা করে দেবেন।"

বিভাসের মজা লাগছে বেশ। এখন সে বেশ একটু স্বাভাবিক বোধ করছে এদের সামনে।

নানারকম লোভনীয় খাবারের প্লেট রাখা হয়েছে সামনে। টিপট থেকে চা ঢেলে দিচ্ছে ধোপদুরস্ত পোশাক পরা সম্ভ্রান্ত চেহারার কাজের লোকটি।

"আমি কিন্তু এত কিছু খেতে পারব না," বিভাস হাত নেড়ে বলল।

সোমা হেসে বলল, "আচ্ছা যা পারেন তা-ই নিন। আজ কিন্তু ডিনারের ব্যবস্থাও আছে।"

বিভাস আঁতকে উঠে বলল, "না না আমার কাজ পড়ে আছে অনেক। আমাকে উঠতে হবে। অতক্ষণ থাকতে পারব না।"

সে জানে এইসব জায়গায় খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে অনেক আদবকায়দা মানতে হয়। তার ওসব ঠিকঠাক আসেই না। বেশ সতর্ক হয়ে তাকে খেতে হবে সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য। কী মুশকিল!

ঋষভ আজ প্রথমেই তাকে ড্রিঙ্কস অফার করতে গিয়েছিল। কিন্তু সোমা "ওটা আর-একদিন হবে বলে" সে প্রস্তাবে জল ঢেলে দিয়েছে।

রাত বাড়ছে। বিভাসকে নিয়ে তার পাঠিকাদের কৌতূহলের যেন অন্ত নেই। এইবার উঠে ভেগে পড়তে পারলে হয়। বিভাস দু'বার ঘড়ি দেখল।

ঠিক এইসময় বিভাসের মোবাইলটা বেজে উঠল। দময়ন্তী। শব্দ নেই। অথচ যেন সশব্দে বেজে উঠেছে একজোড়া ঘুঙুর। একা-একাই। গোপনে। ফোনটা কেটে দেবে, না ধরবে বিভাস?

ফোনটা বেজে-বেজে একসময় থেমে গেল। তারপর দু'মিনিট পরেই আবার অতল জলের আহ্বান, অমোঘ হাতছানি। শেষ পর্যন্ত কানে চেপে ধরল মোবাইলটা দোটানায় দ্বিধাগ্রস্ত বিভাস।

আর নয়, আর নয়। দময়ন্তী তাকে টানছে। টানছে তার বিলাসপুরের সেই নির্জন কোয়ার্টারটা। সেই দু' কামরার ঘর। বইয়ে ঠাসা আলমারি, পাথরের ফুলদানি। আর সেই ঘর আলো করে বসে আছে দময়ন্তী।

**কালো রাস্তা সাদা বাড়ি**

সেবা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান অরবিন্দ রায়কে বাণিজ্যমহলে আরও একটা নামেও সকলে চেনে। অরো রে। গ্লাসগো থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আসা আগাপাশতলা কেতাদুরস্ত এই সাহেব মানুষটিকে প্রায় অজাতশত্রু বলা যায়। ঋষভকে আবার রে সাহেব যেন একটু বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেন। বেশ কিছুদিন হল যোধপুর পার্কের বাড়িটা ছেড়ে অরবিন্দ উঠে এসেছেন সল্টলেকের এই সেক্টর ফাইভে।

পোর্টিকোর নীচে এসে গাড়ি থেকে নামতেই চেয়ারম্যান সাহেবের বিশালাকায় পোষা অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা দৌড়ে ঋষভের কাছে আসার চেষ্টা করতেই রে সাহেব দূর থেকে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "এই রবার্ট, স্টপ স্টপ। তোমাকে কী রোজ-রোজ এটিকেট শেখাতে হবে?"

মুহূর্তেই কুকুরটা বশংবদের মতো লেজ গুটিয়ে ধীরেসুস্থে চলে এল রে সাহেবের পায়ের কাছে।

ঋষভ হেসে বলে, "রবার্ট আপনার খুব বাধ্য স্যার..."

অরবিন্দ রায় একটু যেন করুণ মুখে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ তা বলতে পার। তবে কী জানো, এই বাড়িতে এই একটিমাত্র প্রাণীই আমার ওবিডিয়েন্ট। আর কেউ নয় বোধহয়।"

অরবিন্দ বাড়িতে প্রায় একাই থাকেন। তাঁর স্ত্রী জয়িতা রায় সেলেব্রিটি। তিনি তাঁর নাচের ট্রুপ নিয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রায়ই ফাংশন করতে চলে যান। ওঁদের দুই মেয়ে, জামাই সকলেই আমেরিকায় থাকেন। বাড়ির সামনেই সুদৃশ্য বিশাল ড্রইংরুম। কিন্তু ঋষভকে সেখানে না বসিয়ে দীর্ঘ লাউঞ্জ পেরিয়ে এবং মার্বেল বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে তিনি নিয়ে এলেন দোতলায় তাঁর নিজস্ব একটি অ্যান্টিরুমে। এখানে তাঁর কাজকর্ম করার একটা টেবিল ছাড়াও ছোট্ট দামি একসেট সোফা রয়েছে। ঋষভকে নিয়ে সেখানে বসলেন অরবিন্দ রায়।

দিন সাত-আট আগে তিনি ফোনে ঋষভকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। পরে হঠাৎই ওঁর হায়দরাবাদে একটা কাজ পড়ে যাওয়ায় সে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা বাতিল হয়ে যায়। আজ একটা পাবলিক হলিডে, তাই আজ সকালে আবারও এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। অরবিন্দ সময়ানুবর্তী মানুষ। সময় এতটুকু অপচয় করেন না। তাঁর সঙ্গে দেখা করার যে-টাইম তার এক মিনিট দেরি হয়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। তাই ঋষভ ঘড়ি ধরে ঠিক সকাল দশটায় এখানে পৌঁছেছে। এখান থেকে আবার বালিগঞ্জে একবার মাকে দেখতে যেতে হবেই।

অরবিন্দ রায় শুধু সেবা গ্রুপের চেয়ারম্যানই নন। নানাবিধ কমিটির সঙ্গেও যুক্ত। কোম্পানিজ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাফেয়ার্স-এর বোর্ডে তিনি আছেন। বোর্ড অফ ট্রেড-র একজন সক্রিয় সদস্য তিনি। এছাড়া দু'-একটি এনজিওর পরামর্শদাতাও!

চা আর স্যান্ডউইচ দিয়ে গিয়েছিল বেয়ারা। সময় নষ্ট না করে চায়ে চুমুক দিয়েই অরবিন্দ রায় বললেন, "তোমার ওই দিল্লির প্রজেক্টটার টেকনো ইকনোমিক্যাল সার্ভে রিপোর্টটা আমি দেখলাম ঋষভ। আমার মনে হচ্ছে ইউ আর গোয়িং টু টেক এ রং ডিসিশন। তোমার কোথাও একটু ভুল হচ্ছে।"

ঋষভ ওঁর এই আকস্মিক মন্তব্যে চমকে গিয়ে বলে, "স্যার উড ইউ প্লিজ রিপিট? আমি ঠিক আপনার কথাটা..."

অরবিন্দ রায় মুখখানা থমথমে করে বললেন, "কেন আমি কি স্বগতোক্তি করেছি বলে মনে হচ্ছে তোমার? নাকি তুমি আমায় চ্যালেঞ্জ করছ মিত্র?"

ঋষভ এবার খুব বিনীতভাবে বলে, "সরি স্যার। আমি শুধু এটুকুই জানতে চাইছি ভুলটা আমার কোথায় হচ্ছে।"

অরবিন্দ রায় এবার ঋষভকে দেখলেন একটু। কিছুক্ষণ কোনও কথা বললেন না। তারপর পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ঠোঁটের এক কোণে সেটা ঝুলিয়ে ধরে কথা বলতে লাগলেন, "এই ব্যাপারটা নিয়ে নেক্সট বোর্ড মিটিংয়ে আমি ডিটেলসে যা বলার বলব। কোম্পানি সেক্রেটারিকে বলে দিও এবার বোর্ড এজেন্ডায় প্রথম আইটেম হিসেবেই যেন নয়ডা প্রজেক্টটা থাকে।"

ঋষভ একটু অধৈর্য স্বরে বলে, "তবু যদি একটু আগে থেকে কিছু বলেন...একটা মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারি মিটিংয়ের আগে।"

অরবিন্দ রায় হেসে বললেন, "আই সি। ওয়েল মিত্র, আগেভাগে তোমাকে কিছু বলব বলেই তো বাড়িতে আলাদা করে ডেকেছি। তোমাকে আমি পুত্রবৎ স্নেহ করি, সে তুমি জানো। তোমার প্রতি আমার যে একটা আলাদা সফ্ট কর্নার আছে সেটাও সেবা ফ্যামিলিতে কারও অজানা নয়। আর সেটাই বোধহয় হয়েছে এখন কাল।"

ঋষভ চুপ করে আছে। কিছু বলা উচিত হবে কি না বুঝতে পারছে না। এই অরবিন্দ রায়ই বছর দশেক আগে তাকে একদিন এই কোম্পানিতে নিয়ে আসেন। এর আগে যে-কোম্পানিতে সে কাজ করত, সেখানেও বোর্ডে ছিলেন এই অরবিন্দ রায়ই। ওখানেই কাজের মাধ্যমে সে রে সাহেবের নেকনজরে আসে।

অরবিন্দ রায় বললেন, "ইন মাই থার্টি টু ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স, কর্মক্ষেত্রে আমি যথেষ্ট পলিটিক্স দেখেছি। জেলাসিও দেখেছি অনেক। আমি জানি সেসব কী করে ট্যাক্টফুলি সামলাতে হয়। বিজনেসে আজকাল রিস্ক ম্যানেজমেন্টকে খুব জোর দেওয়া হচ্ছে, তুমি তা জান। আমাদের গ্রুপের অডিট কমিটি রিপোর্ট করে আমাকেই। তবে কিনা অডিট কমিটিতে ওই যে তোমাদের চিফ ফিনানসিয়াল অফিসার কাশীনাথ সান্যাল আছেন, ওঁকে তুমি এই ক'বছরে খুব চটিয়ে রেখেছ মনে হচ্ছে। ম্যানেজমেন্ট..."

ঋষভ ভারী অবাক হয়ে বলে ওঠে, "সান্যালকে! কই আমি তো..."

অরবিন্দ হাত তুলে বললেন, "আমায় শেষ করতে দাও মিটার। কিন্তু ম্যানেজমেন্টের ওয়ান অফ দ্য টুল্স হল ইন্টারনাল অডিট। আর সেই ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্টের লোকদের ওরা লেলিয়ে দিয়েছে তোমার পিছনে। তুমি নাকি কোনও রুল্স রেগুলেশন বা ইন্টারনাল কন্ট্রোলের তোয়াক্কাই করছ না। খালি রেজাল্ট, প্রোডাকশন, প্রফিট ওই সবই তোমার লক্ষ্য। কিন্তু ম্যানেজমেন্টের দোহাই দিয়ে ওরা তোমার কাজের প্রসেসটা ডিলেড করতে চায়, লেংদি করতে চায়, এই নাকি খালি তোমার অভিযোগ? ওরা খুবই চটে আছে। শুধু কাশীনাথই নয়, হিউম্যান রিসোর্সের ডিরেক্টর নাগরাজনও এই সেদিন ফোন করে ঠিক একই কথা বলল আমাকে। ব্যাপারটা আমাকে খুব ভাবাচ্ছে মিত্র। গোপনে একটা টারময়েল তৈরি হয়েছে মনে হয়। যার তুমি কিছুই জানো না।"

ঋষভ আজ এসব কথা শোনবার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে মাথা নিচু করে গুম হয়ে কিছুক্ষণ ভাবল। তার সময়টা এখন সত্যি ভাল যাচ্ছে না। কয়েকদিন আগে অল্পের জন্য একটা বড় প্লেন দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছে। ফিরে আসতেই মায়ের কঠিন অসুখটা ধরা পড়ল। তারপর আজ আবার খোদ


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

চেয়ারম্যান সাহেবের মুখ থেকে এইসব তিক্ত সমালোচনা শুনতে হচ্ছে।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে অরবিন্দ রায় খানিকটা আন্তরিক সুরে বললেন, "ডোন্ট বি ডিসহার্টেন মিত্র। আমি তোমার পাশে সব সময়ই আছি। আমার নির্দেশ কেউ সারপাস করতে পারবে না। তবে কী জানো, তোমার একটা ফিন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে খুব ভাল হত। আজকাল ফাইন্যান্সের লোকদের খুব দাপট চারিদিকে।"

ঋষভ যেন খানিকটা অভিমানের সুরে বলে, "আর ম্যানেজমেন্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা কোয়ালিটি কন্ট্রোল এসব কিছুই নয় স্যার? মার্কেটিংটাও তো আমি নিজে দেখি। আমাদের কোম্পানির টার্নওভারের গ্রাফটাই বলে দেবে যে..."

অরবিন্দ রায় খানিকটা সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "মিত্র, আমি সবই বুঝি। আমি নিজেরও ফাইন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ড নয়। আমি বরং তোমাকে একটা অ্যাডভাইস দিই। তুমি পারলে লন্ডনে এসিসিএ করেসপন্ডেন্স কোর্সটা কমপ্লিট করে নাও। ইউ আর অ্যাকটিভ, ডিভোটেড অ্যান্ড ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং। তাই তোমাকে বলছি। যদিও এই সময়ে পড়াশুনো করা বা পরীক্ষা দেওয়া বেশ টাফ ব্যাপার। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি পারবে, সফল হবে।"

ঋষভ এবার একটু প্রশ্রয় পেয়ে বলে, "স্যার যাই বলুন, ফাইন্যান্সের লোকেরা বড় বেশি থিয়োরি মেনে চলে। আউট-কিউ ব্যাপারটা ওদের মধ্যে প্রায় নেই বললেই চলে...!"

অরবিন্দ রায় এবার একটু হেসে ফেলে বললেন, "তুমি বেশ চটে আছ দেখছি। ওদের শত্রুপক্ষ ভাবতে পার, কিন্তু দুর্বল মনে কোরও না একবারও।"

চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবে স্যান্ডউইচে কেউই হাত দেয়নি। ঋষভের মনটা বিস্বাদে ভরে গিয়েছে। এত পরিশ্রম, এত ডেডিকেশন, সংসার-টংসার সব ভুলে এই যে প্রতিষ্ঠানে এত মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়া...এসবের শেষে তাহলে এই ছিল তার পুরস্কার!

এইবার উঠতে হবে। বেলা হল বেশ। বালিগঞ্জে হিন্দুস্তান পার্কে মাকে একবার দেখতে যেতেই হবে। গত সপ্তাহটা মাকে নার্সিং হোমে রাখা হয়েছিল। এখন আবার বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। ভাল নার্স রাখা হয়েছে, চব্বিশ ঘন্টার জন্য। তিথি আর অম্বরীশকে ফিরে যেতেই হবে আমেরিকায় দিন দশেক পরে। ডাক্তার বলছেন, এখন মাস ছয়েক মতো সারভাইভ করে যাবেন মনে হয়। তিথিরা আবার ডিসেম্বরে ক্রিসমাসের লম্বা ছুটিতে আসবে। কিন্তু এই সময়টা মায়ের পাশে সর্বক্ষণের জন্য বাড়ির একজন কেউ যদি থাকত! সোমা সারাদিনটা থাকবে বলে রাজি হয়েছে। ওর মেজাজ-মর্জি যেমনই হোক, ঋষভ লক্ষ করেছে শ্বশুর-শাশুড়িকে ও আন্তরিকভাবে ভালবাসে। এটা দুর্লভ ব্যাপার।

ঋষভকে অন্যমনস্ক দেখে অরবিন্দ রায় বললেন, "কী ভাবছ? তোমার কাজের খুব প্রেশার। তোমার মাথায় অনেক টেনশন, অনেক প্ল্যান। আমি কি তোমার মাথায় তার উপর আরও প্রবলেম চাপিয়ে দিলাম? সরি মিত্র।"

ঋষভ নিজেকে একটু হাল্কা করার জন্য বলল, "প্রবলেম টেনশন আর নানা বিজনেস হ্যাজার্ডস নিয়ে আমাকে তো সব সময় চলতে হয়। আর সেগুলো থেকে স্মার্টলি কীভাবে বেরিয়ে আসতে হয় তাও ভাবতে হয় আমাকে। আপনার কথাগুলো খুবই অ্যালার্মিং আর থট-প্রোভোকিং। তবে আমি আশা করি এসব ম্যানেজ করে নিতে পারব। কিন্তু ওই নয়ডার প্রজেক্টটার ব্যাপারে আপনাকে একটা ওপিনিয়ন দিতেই হবে।"

অরবিন্দ খানিক চিন্তা করে বললেন, "তুমি ডাইভারসিফিকেশনের কথা ভাবছ? আর তাই হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাকশন থেকে একটা সম্পূর্ণ অন্য সেক্টর পাওয়ারে ইনভেস্ট করতে চাইছ। কিন্তু আমার কাছে খবর আছে, উত্তরপ্রদেশ সরকার পাওয়ার কাস্টমারদের ওপর আরও ট্যারিফ বাড়াতে চাইছে। ওই এরিয়ার সব ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা একযোগে গভর্নমেন্টের কাছে এই ব্যাপারে লিখিত আপত্তি জানিয়েছে। তারা ইলেকট্রিসিটির বদলে জেনারেটরের উপর ভরসা করবে। আর তাতে তোমার পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাফেক্টেড হবে। চাহিদা কমে যাবে..."

"সেটা হবে না স্যার। আমরা ব্যাপারটা শুনেছি। যাদের সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারে নামছি, তারা পাওয়ার পারচেস এগ্রিমেন্ট করে নেবে ইলেকট্রিক সাপ্লাই বোর্ডের সঙ্গে। পনেরো বছরের কন্ট্র্যাক্ট।"

চেয়ারম্যান একটুক্ষণ ভেবে বললেন, "আচ্ছা, তুমি এগোতে পার। তবে ফাইন্যান্সের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করলে তুমি সুফল পাবে। ব্যাঙ্ক লোন আরও একটু কমিয়ে প্রজেক্টে ইকুয়িটিটা বাড়ানো যায় কিনা, এ ব্যাপারে কাশীনাথের কাছে রিপোর্ট চাও।"

"স্যার আই রেসপেক্ট ইওর অ্যাডভাইস।"

অরবিন্দ রায় স্মিত হাসলেন, "অ্যান্ড আই ট্রাস্ট ইউ মিত্র।"

মাকে দেখে চেনাই যায় না। এই সেই তার লাইভলি মাদার? এই ক'দিনে কেমোথেরাপি দিয়ে শরীর হয়ে গেছে বিবর্ণ।

ঋষভ এসে বিছানার পাশে বসতেই অনুভা শুকনো হেসে কষ্টে থেমে থেমে বললেন, "ভাল আছিস? ছুটির দিনেও কী এত খাটিস ঋষি?"

"ও কিছু নয়। তুমি কেমন আছো তাই বলো আগে।"

অনুভা উত্তর না দিয়ে চোখ বুজলেন। তাঁর দু'চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। মা কি তবে মনে-মনে বুঝতে পারছেন, তাঁর সময় শেষ হয়ে এসেছে? নার্স মেয়েটি এগিয়ে এসে একটা পরিষ্কার রুমাল দিয়ে জল মুছিয়ে দিল।

ঋষভ বলল, "এপাশের এই জানালাটা বন্ধ রেখেছেন কেন? পর্দা সরিয়ে জানালাটা খুলে দিলে হয় না?"

নার্স মেয়েটি জড়োসড়ো হয়ে বলে, "এতক্ষণ খোলাই ছিল স্যার। এখন বেলা হয়েছে। পশ্চিমের রোদ থেকে বাঁচাতে পর্দা টেনে দিয়েছি।"

ঋষভ মা'র দিকে ঝুঁকে বলল, "তোমার কী খেতে ইচ্ছে করে মা?"

"কিছু ভাল লাগে না রে ঋষি, মুখে রুচি নেই একদম।"

সোমা ঘরে ঢুকে বলল, "আমি এবার মা'র কাছে বসছি। তুমি যাও, বাবার সঙ্গে গিয়ে একটু কথা বলো গে।"

সোমা সেই সকালবেলা চলে এসেছে এখানে। ওকে বালিগঞ্জে নামিয়ে সুখলাল ফিরে গেলে ঋষভ নিজেই ড্রাইভ করে চলে গিয়েছিল অরবিন্দ রায়ের বাড়ি।

বাবার কাছে এসে বসতেই তিথি দু'কাপ কফি দিয়ে গেল দাদা ঋষভ আর স্বামী অম্বরীশের সামনে। বাবা বসে আছেন কাছেই বড় আরামকেদারাটায়। মেহগিনি কাঠের উপর গদি লাগানো বিশাল আরামকেদারা। এ বাড়ির খাট, আলমারি, সোফা, টেবিল সব কিছুর মধ্যেই বনেদি ভাব। বাড়িটার বয়সও প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর। এই অঞ্চলের প্রায় সব পুরোনো বাড়ি কিনে নিচ্ছে প্রোমোটাররা। উঠছে বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি। মা-বাবা চলে গেলে এই বাড়িরও সেই একই নিয়তি হবে তাতে সন্দেহ নেই। ঋষভের বাবা সুকুমার মিত্র হাই কোর্টের চিফ জাস্টিস হয়ে রিটায়ার করেছেন বেশ কয়েকবছর হয়ে গেল। তাঁর বয়স এখন প্রায় সাতাত্তর। আর মা আরও দু'-চার বছরের ছোট। ওঁরা দু'জনেই বেশ শক্ত-সমর্থ ছিলেন। হঠাৎ মাকে এই কালরোগে ধরল। মা চলে গেলে বাবা কোথায় থাকবেন এবং তাঁর দেখাশোনা কীভাবে হবে কে জানে।

বাবা বোধহয় থট রিডিং জানেন। বললেন, "তোমাদের মা যদি আমার আগে সত্যিই চলে যান তাহলে আর যাই করো, আমাকে ওল্ড হোমে পাঠিয়ে দিয়ো না তোমরা। ওতে আমি মোটেই শান্তি পাব না।"

কথাটা শোনামাত্র অম্বরীশ তাকায় ঋষভের দিকে। অম্বরীশ নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, "এসব ভাবনা এখন আপনার মাথায় আসছে কেন?"

সুকুমারবাবু বললেন, "এখনই তো আসবে। রিয়েলিটিকে ফেস না করে মুখ ঘুরিয়ে থাকলে চলবে? তোমার মায়ের দিন ফুরিয়েছে আমি জানি।"

ঋষভ বলল, "বাবা, আমরা সবাই মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করছি, মা সেরে উঠবে। হয়তো একটু দেরি হবে।"

"আমাকে স্তোকবাক্য দিয়ো না তোমরা। তোমার মায়ের সিমটম দেখে, চেহারা দেখে, আর চিকিৎসার বহর দেখে আমি বুঝে গিয়েছি অনুভার কী অসুখ হয়েছে। এখন ওকে বরং শান্তিতে যেতে দাও।"

ঋষভ আর অম্বরীশ চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। এই বাড়ির মসৃণ মোজাইক টাইলসগুলো চকচক করছে। দেওয়ালে কোথাও একফোঁটা ঝুল নেই। আসবাবপত্র ঝকঝকে করে মোছা। দেওয়ালে র‍্যাকভর্তি সুদৃশ্য বিদেশি খেলনা আর কাচের দামি বাসন। নীচে একতলায় বাবার অফিস-ঘরটিতেও থরে-থরে বাঁধানো বই সাজানো। ঝকঝকে একরাশ রোদ এসে লুটিয়ে পড়েছে সুদৃশ্য গ্রিল দেওয়া বড় ব্যালকনির মেঝেতে। গরমে বাইরেটা ঝলসাচ্ছে। মে মাসের শেষ হতে চলল। বর্ষা নামতে এখনও অনেক দেরি।

এইসব প্রাত্যহিক মুহূর্ত, পার্থিব দৃশ্যে ছন্দপতন ঘটিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই চলে যাবে মা। ঋষভের চোখে জল আসছে। সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে বসে রইল।

এর আগে যা কখনও হয়নি, তাই যেন হল হঠাৎ। এক অভূতপূর্ব বৈরাগ্যের ভাব এল ঋষভের মনে। অফিস, পদোন্নতি, কেরিয়ার, বিজনেস ম্যাগনেট হতে চাওয়ার জটিল তন্তুজাল ছিঁড়ে বের হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। খুব ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে এর বাইরেই আছে মুক্তির স্বাদ। প্রাণের আরাম।

একসময় তার বাবারও কি কম প্রতাপ ছিল? হাই কোর্টের চিফ জাস্টিস বলে কথা! কত সম্মান দেখিয়েছে লোকে, কত আর্জি নিয়ে ছুটে এসেছে অসহায় মানুষজন। কত সেলাম, কত উপার্জন। আর আজ সেই মানুষটিই এই বয়সে তার অনুজদের কাছে করুণা ভিক্ষা করছেন।

এরপরও কি ইচ্ছে করে সাফল্যের দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে আরও উপরে উঠতে? এই বিত্ত বৈভব সম্মান তো চিরস্থায়ী নয়। আজ অরবিন্দ রায় যা ইঙ্গিত


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

দিলেন, তাতে তার সফলতার সিঁড়ির নীচে যে ফাটল ধরতে শুরু করেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

অনেকদিন পর এই বাড়িতে সকলে একসঙ্গে হয়েছে। ঋষভ সময় করে উঠতে পারেনি। রবিবারগুলোতেও নয়। হয় লাঞ্চে, নয় ডিনারে এসে কিছুক্ষণের জন্য যোগ দিয়েছে।

সোমার সঙ্গে মায়ের খুব ভাব। সে যেন শুধু তিথির বউদি বা অনুভার বউমা নয়, এ বাড়িরই বড় মেয়ে। আর অনুভার সবচেয়ে বড় গুণ তিনি কারও উপর নিজের মত চাপিয়ে দেন না। কখনও আদেশের সুরে কথা বলেন না বলে এই বাড়ির ছেলেমেয়ে, পরিচারক, ড্রাইভার, সকলের কাছেই তিনি বরাবর অতি প্রিয়। তাই তাঁর চলে যাওয়ার কালো মেঘ এ পরিবারের মাথায় ঘনিয়ে আসাতে বাড়ির কারও চোখের জল আর বাঁধ মানছে না।

ঋষভের মনে আছে, তাদের বিয়ের পরপরই সোমা হঠাৎ শক্ত টাইফয়েড বাঁধিয়ে বসে। একটা কোম্পানির ট্রেনিংয়ের জন্য ঋষভের আবার তখনই মুম্বই যাওয়া একেবারে ঠিক। কোম্পানির স্বার্থে ট্রেনিংটাও খুবই জরুরি। উচ্চাভিলাষী ঋষভ ছুটির কথা বলে এই ট্রেনিংটা যে ক্যানসেল করবে না, সেটা ঠিক বুঝে গিয়েছিলেন অনুভা। এবং শাশুড়ি হয়েও নিজের মেয়ের মতো করে সোমাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। ছেলেকে বলেছিলেন, "তুই নিশ্চিন্তে চলে যা ঋষি। বউমার ভার আমার উপর রইল," সেই ঘটনা থেকেই শুরু। ঋষভকে সোমা সেই থেকে মনে-মনে আজও ক্ষমা করতে পারেনি।

খুব সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সোমা। ওর বাবা ছিলেন সুকুমারবাবুদের কোর্টের একজন অতি সাধারণ উকিল। তেমন কিছুই পসার ছিল না। তবে তিনি সুকুমারবাবুর সঙ্গেই প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন বলে দু'জনের একটা সখ্য গড়ে উঠেছিল। নানা পরামর্শ নিতে সুকুমারবাবুর এই বালিগঞ্জের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন তিনি। একদিন সঙ্গে মেয়ে সোমাকে নিয়ে এলে সুকুমারবাবুর ভারী পছন্দ হয়ে যায়। আর বিয়ের প্রস্তাবটাও অচিরে পাকা হয়ে যায়। আর হবে না কেন? সোমার বাবা হাতে যে চাঁদ পেয়ে গিয়েছিলেন এ বিয়ের প্রস্তাবে।

ঋষভ তখন লন্ডনে এমবিএ করছে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। ফিরে এসে বাবা মায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো মনের জোর তখন তার ছিল না। কারণ লন্ডনে থাকতে অলিভিয়া নামে এক ইতালিয়ান মেয়ের সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ব্যাপারটা শরীর পর্যন্ত গড়িয়েছিল। দেশে ফিরে আসার ঠিক মাস ছয়েক আগে একদিন অলিভিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে তাদের বাড়িতে গেলে, ঋষভ তাকে একজন অন্য পুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় দেখে ফেলে। ব্যাপারটা তার বুকে হাতুড়ির ঘা দিলেও অলিভিয়ার দিক থেকে কোনও হেলদোলই দেখা যায়নি।

অতএব দেশে ফিরে তখন সে ছিল রীতিমতো উদ্‌ভ্রান্ত। বুকের ভিতরটা ভীষণ ফাঁকা। সোমাকে দেখার পর ঘুমের ট্যাবলেটগুলো তাই গোপনে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিল সে। ভাল মানুষের কোনও আপত্তি না করে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল।

অরবিন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করার পরদিন অফিসে এসে কাশীনাথ সান্যালকে নিয়ে একটা মিটিং করে ঋষভ। সে মিটিংয়ে নাগরাজন আর কোম্পানি সেক্রেটারি অতীশ রায়চৌধুরীকেও ডেকে নেয়। কাল সারারাত ভাল ঘুম হয়নি। চেয়ারম্যানের কথাগুলো বারবার তাকে তাড়া করে ফিরেছে। এতদিন তাকে কেউ বলেনি যে, তারও ড্র-ব্যাক আছে, তারও ডিসিশনে ভুল হয়। এমনকী, এই কোম্পানিতে যেখানে সে তার সমস্ত মেধা, প্রচেষ্টা আর পরিশ্রম ঢেলে দিয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করে, সেখানেও তার বিরুদ্ধে গোপনে একটা লবি তৈরি হয়েছে। তারা চেয়ারম্যানকে রিপোর্টও করেছে তার বিরুদ্ধে!

এতদিন যাদের একান্ত সহযোগী, একান্ত অনুগত আর বিশ্বস্ত বলে মনে হয়েছে, আসলে তারা তা নয়। মুখোশ পরা এই মানুষগুলির আসল মুখটা ঋষভ এখনও বোধহয় দেখতে পায়নি। এই যে তিনজন বসে আছে তার সামনে, এরা এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। কোম্পানির বর্তমান কর্ণধার।

ঋষভ কি এদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে? ভালোমানুষ সাজবে এদের সামনে? ইগনোর করবে? নাকি ফায়ার করে কোম্পানি থেকে বের করে দেবে সকলকে?

"হাউ ইজ় ইওর মম স্যার?" সেক্রেটারি অতীশের বয়স কম। তাই সে বোধহয় একটু হায়ারার্কি প্রোটোকল মেনে চলে।

"ভালই আপাতত। তবে শেষ পর্যন্ত কী হবে বলা যাচ্ছে না।"

"আপনি ডাক্তার দীপাঞ্জন সেনের সঙ্গে একবার কনসাল্ট করবেন কি? আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিতে পারি। ক্যানসার স্পেশ্যালিস্টদের মধ্যে কলকাতায় উনি এখন বাই ফার দ্য বেস্ট," কথাটা বলল কাশীনাথ।

"থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ সান্যাল। আমি রিলেটিভদের সঙ্গে কথা বলে আপনাকে না হয় জানাব। আসুন এবার কাজের কথায় আসা যাক।"

নাগরাজন বলে উঠল, "ও ইয়েস ইয়েস। তবে মিস্টার মিত্র, আমি বোধহয় তিরুপতি যাব নেক্সট উইক। আই মাস্ট প্রে ফর ইয়োর মাদার, আই উইল ব্রিং ব্লেসিংস ফ্রম তিরুপতি স্বামী।"

এরা এখন যেভাবে কথা বলছে, যেরকম ব্যবহার করছে, তাতে এদের ঋষভের বিরুদ্ধে কোনও দুরভিসন্ধি বা অসূয়া আছে মনেই হয় না। তবে ঋষভের ভুল ভাঙল খানিক পরেই।

মিটিং শুরু হয়ে গেল। কনফারেন্স রুমের বাইরে এখন লালবাতি জ্বলে উঠেছে। ঋষভের সব জরুরি ফোন এখন সামলাবে ওর পি এ ঐশী চ্যাটার্জি।

ঋষভই শুরু করে প্রথমে।

"আমি আমাদের নয়ডা প্রজেক্টের ব্যাপারে একটা সেকেন্ড থট দিতে চাই। এ ব্যাপারে আপনাদের কাছে কিছু ফিডব্যাক আছে কি? নেক্সট বোর্ড মিটিংয়ে আমাদের এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। আর সে সিদ্ধান্ত যেন কোনওক্রমে ভুল সিদ্ধান্ত না হয়। সেবা গ্রুপের যেন বদনাম না হয় কোনও।"

অতীশ বলে, "স্যার আপনি লোন নিতে চাইছেন তো ব্যাঙ্ক থেকে? এ ব্যাপারে জেনারেল মিটিং করতে হবে আগে। আমাদের বরোয়িং পাওয়ার বাড়াতে হলে হোল্ডারদের দিয়ে সেটা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।"

কাশীনাথ বলল, "মিস্টার মিত্র, আমি আগেই বলেছিলাম, ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টের জন্য হিউজ মানি দরকার। ব্যাঙ্ক লোন না নিয়ে শেয়ার ইসু করাটা অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আইপিও-র মাধ্যমে গেলে..."

"এসব কথা আপনারা এতদিনে বলছেন?"

"আমি আগেও অনেকবার বলেছি। আপনি শোনেননি। অথবা হয়তো ইগনোর করেছেন।"

"তাহলে কী করতে বলছেন আপনারা?"

"আমরা কিছু বলব না। যা বলার তা বলবে বোর্ড।"

"বোর্ড মানে তো আমরাই। এখনই কি একটা সঠিক সিদ্ধান্তের কথা ভেবে রাখা যায় না?"

"অবশ্যই যায়। তাহলে আপনাকে আবার রিপোর্টগুলো দেখাতে হবে।"

"রেডি আছে?"

"আছে। আপনার টেবিলেই পড়ে আছে কোথাও। আমার অডাসিটি মাপ করবেন। আপনি দেখার প্রয়োজন মনে করেননি সেগুলো।"

অন্য সময় হলে স্পর্ধার একটা সমুচিত জবাব দিতই ঋষভ। কিন্তু কাল থেকে মনটা একেবারেই মুষড়ে আছে। কোনও কথা না বলে সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সকলের মুখের দিকে। আরও কিছু চাপানউতোর চলল। ঋষভ যেন আজ একটু কোণঠাসা হয়ে গেছে এদের কাছে।

ওঠার ঠিক আগে নাগরাজন বলল, "আমি ওয়েবসাইটে দেখেছি, নয়ডার ভেঞ্চার পার্টির লেবার ফোর্স অনেক কম। আর খবর নিয়ে জেনেছি, কয়েক বছর ধরে ওদের ওখানে লেবার আনরেস্ট চলছে। মিস্টার মিত্র উই শুড নট গো ফর জয়েন্ট ভেঞ্চার উইথ সাচ এ পার্টি।"

মিটিংয়ের পরও মনটা ঠিক বশে এলো না ঋষভের। তার কমান্ডিং পাওয়ার যেন এই দু'দিনেই হারিয়ে যেতে বসেছে। তার মতো দৃঢ়চেতা লোকেরও বিভ্রম হচ্ছে বারবার।

ঋষভের ঘরে ফোন বেজে ওঠে। ঐশী। "ইয়েস?"

"স্যার আপনার কয়েকটি কল এসেছিল এর মধ্যে। সেগুলো নোট করে রেখেছি। নিয়ে আসব?"

"এসো।"

"আর স্যার, এক ভদ্রলোক প্রায় আধঘণ্টার উপর আপনার জন্যে অপেক্ষা করে এখানে বসে আছেন। অবশ্য আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। বলছেন পার্সোনাল।"

"পার্সোনাল! নাম কী? অম্বরীশ চৌধুরী?"

"না। বিভাস হালদার।"

"আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে পাঠিয়ে দাও ওকে।"

বিভাস ঘরে ঢুকতেই ঋষভ মুখে একটা কৃত্রিম ভদ্রতার হাসি টেনে বলল, "বিভাস তোমাকে তো বলেছি অফিসে আমি ভয়ানক ব্যস্ত থাকি। আর এখানে পার্সোনাল সময় দেওয়াটা এই অফিস কালচারের বাইরে। তুমি বাড়িতে দেখা করলেই তো পারতে। যাক কিছু মনে কোরো না। বলো কী ব্যাপার।"

"সরি। মাত্র দু' মিনিট সময় নেব ঋষভ তোমার কাছে।"

"বলো," ঋষভের মুখে অসহিষ্ণুতার ছাপ।

বিভাস একটু গলা খাঁকারি দেয় প্রথমে। এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর

Be familiar with www.banglatorrents.com

যেন একটু অসহিষ্ণুভাবে বলে, "হঠাৎ একটু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে। মাস দুয়েকের জন্য তুমি কি একটু সাহায্য করতে পারবে? খুব জরুরি ছিল। চাইতে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু..."

"কত?"

"এই ধরো থার্টি থাউজ্যান্ডের মতো। তবে মাস দুয়েকের মধ্যেই শোধ দিয়ে দেব। কথার খেলাপ হবে না।"

ঋষভ একটু অপ্রস্তুত মুখে বলে, "কিন্তু আমার টাকা তো সব ফিক্সড করা রয়েছে বিভাস। তাও আবার সোমার নামে। ক্যাশ টাকা বলতে এই সময় তো...তার ওপর মা'র অসুখে অনেক টাকা লাগছে।"

"পারবে না?" বিভাসের মুখে হতাশার চিহ্ন।

"আচ্ছা একটু ভেবে দেখি। তবে শোনো, এ ব্যাপারে প্লিজ অফিসে নয়। ছুটির দিনে আগে খবর দিয়ে বাড়িতে চলে এসো। চেষ্টা করে দেখব। কমিট করতে পারছি না," বলে ঋষভ ল্যাপটপে চোখ রাখে।

"আচ্ছা। তাহলে আজ আসি।"

বিভাস বেরিয়ে যেতেই ঐশী এসে ঘরে ঢোকে। পাশে এসে দাঁড়ায় নোটবুক হাতে। কখনও সালোয়ার কামিজ পরে সে, কখনও শাড়ি। আজ পরেছে সাদা খোলের একটা চমৎকার জামদানি শাড়ি। অবশ্য যত সাধারণ পোশাকই সে পরুক, ওর দিকে তাকালে চোখ আটকে যাবেই। ঐশীকে সামনে দেখে ঋষভের মনে কতবার কতরকম ইচ্ছে যে হয়েছে।

আজও হল। আর আজ এই বারবার পরাহত মনটাকে সে আর কিছুতেই বাগে রাখতে পারল না। আচম্বিতে ঝটকায় দু'হাত বেষ্টন করে ঐশীকে টেনে নিল নিজের কোলে। তারপর ওর বুকের আঁচল সরিয়ে দিয়ে মুখ ডুবিয়ে দিল ওর নরম বুকে। আশ্চর্য, ঐশী কিন্তু একটুও বাধা দিচ্ছে না। ওর শরীর থেকে ভেসে আসছে মন পাগল করা সুগন্ধ। উন্মুক্ত ওর শুভ্র বুকের ঠিক মাঝখানে ঝুলছে একটা মহার্ঘ্য লকেট।

"কী হয়েছে স্যার, শরীর খারাপ লাগছে?"

ঐশীর জলতরঙ্গের মতো সংলাপে যেন সম্বিত ফিরে পেল ঋষভ। কী সব আবোলতাবোল ভাবছিল সে এতক্ষণ।

"না না, কিছু হয়নি আমার। আমি ঠিক আছি।"

"দেখলাম আপনার চোখ দুটো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। মাথাটা ঝুঁকে পড়ল টেবিলে। খুব স্ট্রেন যাচ্ছে স্যার? আপনি বরং ক'দিন একটু ছুটি নিয়ে নিন।"

"ঐশী, ডোন্ট ওরি। আই অ্যাম অলরাইট। পারফেক্টলি অলরাইট।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক। আপনি যেতে পারেন এখন।"

একথা বলল বটে ঋষভ, কিন্তু ঐশীর দিকে তাকানো তার দু'চোখ জুড়ে তখনও সুতীব্র সতৃষ্ণ দৃষ্টি। ঐশীও কিন্তু তখনই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল না। চোখও ফেরাল না একটুও। বরং ঋষভের কামার্ত চোখ দুটোর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। ঘরে আর কেউ নেই। শুধু অবাধ্য এক সময় বয়ে যেতে লাগল নিঃশব্দে।

**প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই?**

বিলাসপুর স্টেশনে ট্রেন থামলেই বিভাসের মনটা একটু অন্যরকম হয়ে যায়। সে এই অনুভূতিটার নাম দিয়েছে সৃষ্টিসুখের উল্লাস।

বন্ধু-সম্পাদক রণজয়দা প্রতি সপ্তাহে ফোনে তাকে তাগাদা দিয়ে যাচ্ছেন, পুজোসংখ্যার লেখার এক কিস্তি অন্তত সামনের মাসে জমা দেওয়ার জন্য। অথচ লেখাটা এগোচ্ছেই না। কিন্তু মনে-মনে বিভাস বেশ জানে, দু'দিন বিলাসপুরে দময়ন্তীর সঙ্গে কাটিয়ে কলকাতায় আবার ফিরে গেলেই তার কলমের মুখে স্রোতের মতো নেমে আসবে আশ্চর্য সাবলীল গদ্য। এক অফুরান নির্মান-কৌশল।

প্ল্যাটফর্ম ধরে বিভাস গেটের দিকে ধীরে-ধীরে হাঁটতে থাকে। জংশন স্টেশন বলে সব সময় এই স্টেশনে বেজায় ভিড় আর হট্টগোল। বেরোবার মুখে গেটের বাঁ দিকে দেওয়ালের গায়ে ট্যাবলয়েডে খোদাই করা রয়েছে বিলাসপুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি কবিতার কয়েক ছত্র।

প্রতিবারে মতো লেখাটা এবারও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পড়ল বিভাস। স্টেশনের ঠিক বাইরেই দাঁড়ানো রয়েছে কয়েকটি ভাড়া খাটবার জন্য প্রাইভেট কার আর কয়েকটি ভ্যান রিকশা। বিভাস দরাদরি করে একটা গাড়ি ভাড়া করল। বিলাসপুর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ কিলোমিটার দূরে শালডমরু নামে একটা প্রায় পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে থাকে দময়ন্তী। মাত্র সাড়ে ছশো স্কোয়্যার ফিটের তার ছোট্ট কোয়ার্টারটায় বেডরুম একটাই। বিভাসের সে ঘরে প্রবেশাধিকার নেই। সে রাত কাটায় দময়ন্তীর ছোট্ট বসার ঘরের সোফা-কাম-বেডে। এই পাঁচ-ছ'বছরে বিভাস একাধিকবার দময়ন্তীকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করে প্রগাঢ় চুম্বন এঁকে দিয়েছে তার কপালে ও ঠোঁটে। কিন্তু তার বেশি একটুও এগোতে পারেনি। তবু এই সান্নিধ্যটুকুই বা কম কী?

গাড়ির পিছনের সিটে গা এলিয়ে বসে বিভাস কাঁধের ঝোলাটা পাশে রাখল। এছাড়া ছোট্ট একটা সুটকেস রয়েছে সঙ্গে। দু'তিন মাস অন্তর দু'-তিন দিনের জন্য এরকম বেরিয়ে পড়াটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। মা এবং রুমকি দু'জনেই জানে যে, লেখার ব্যাপারে, সভাসমিতি করতে বা একটু বনে-জঙ্গলে গিয়ে লেখার রসদ জোগাড় করতে মাঝেমধ্যেই বাইরে যেতে হয় বিভাসকে। আর যা-ই হোক, তার লেখাতেই তো সংসার চলে। তবে সে শুধু কোনওক্রমে চলাটাই। এর বেশি কোনও দায়-দায়িত্ব এলে সেটা সামলানো যে কী কঠিন হবে, সেটা বিভাসও ভালরকম জানে। ভাগ্যিস রুমকি একটা স্কুলে পড়ানোর কাজ পেয়েছে। পুজোসংখ্যার লেখাগুলি বিভাসের কাছে এক আর্থিক সংস্থানের উপায়ও বটে। ঘরভাড়া, রাইয়ের স্কুল ফি, মা'র ওষুধপত্র, ইলেকট্রিক বিল, মোবাইল বিল। ধ্যাত্তেরি! এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে একদম ভাল লাগে না বিভাসের। ভাগ্যিস রুমকি আছে। আর মা এই বয়সেও বেশ হাল ধরে রেখেছে সংসারের। তার এই দু'দিনের পালিয়ে আসাটা সত্যিই ছুটির স্বাদের মতো। এক নির্ভেজাল মুক্তি। দময়ন্তীর সঙ্গে তার এই ক্ষণস্থায়ী সহবাসটুকু যেন টনিকের মতো কাজ করে মনে।

অলকেন্দু কিন্তু আজও জানে না বিভাসের সঙ্গে দময়ন্তীর এই গোপন সম্পর্কের কথাটা, এই যোগাযোগ রাখার ব্যাপারটা। দিল্লি থেকে ফেরার পর অলকেন্দুর সঙ্গে বার দুয়েক দেখা হয়েছে। অলকেন্দু বলেছে, সে তার নবলব্ধ বান্ধবী চান্দ্রেয়ীর সঙ্গে দু'মাস মাত্র মিশেই নাকি একেবারে ফেডআপ। বিভাসকে সে এতদিন বলেনি কথাটা। কিন্তু এখন একটা ডিসিশন না নিলেই নয়। বিভাসের কী মত, জানতে চেয়েছে অলকেন্দু।

"প্রবলেমটা ঠিক কোথায় সেটা তো বলবি?" বিভাস প্রশ্ন করেছে।

"সেরকম স্পেসিফিক কিছু নয়। আসলে কী জানিস, আমার তো হরদম টুরে যেতে হয়। সেমিনার থাকে, ট্রেনিং থাকে। সেটা চান্দ্রেয়ীর মনে হয় পছন্দ নয়। ওর ধারণা, আমি মিথ্যে বাহানা দিয়ে কলকাতার বাইরে গিয়ে হোটেলে উঠে মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করি।"

"এই কথা বলেছে ও?"

"না ঠিক তা বলেনি। তবে আমার অবর্তমানে অফিসে এসে খোঁজখবর নিয়েছে যে আমি কোথায় গিয়েছি, কেন গিয়েছি। দু' একবার তো ও যেতেও চেয়েছে আমার সঙ্গে।"

"নিয়ে গেলেই তো পারিস।"

"ধুত! সে হয় নাকি। অফিসের লোক কী ভাববে, হেড অফিসে কী বলবে। তখন আমাকে নিয়ে টানাটানি। আমাদের এম ডি মানুষটা আবার পিউরিটান টাইপের। ব্যাপারটা ভাল চোখে নেবে না মোটেও!"

"বয়ে গেল তাতে তোর।"

"কীসের বয়ে গেল রে? চাকরিতে এখন এসব খুব ম্যাটার করে। সব অফিসেই একটা সোশ্যাল অ্যাটমসফিয়ার আছে। সে হয় না। আমি ভাবছি চান্দ্রেয়ীকে ফুটিয়ে দেব। তুই কী বলিস?"

"একটা কথা বলব অলক?"

"বল।"

"তুই মেয়েদের সঙ্গে যেভাবে রিলেশনশিপ করিস আর তারপর হঠাৎই যেভাবে সেটা ভেঙে দিস, সেটা তোর একটা স্টাইল। তবু আমি কি কখনও তোকে ক্রিটিসাইজ করেছি অলক? আমি ব্যক্তি-স্বাধীনতায় খুব বিশ্বাসী, সেটা কী তোকে বলে দিতে হবে?"

"সে আমিও। তবে আমার বাবা বলতেন যে, যা ইচ্ছে হয় সেটাই করবি, তবে পরে বিচার করেও দেখবি সব সময়। একসময় ভালো-খারাপ ঠিক আলাদা করে বুঝে নিতে পারবি।"

"ওইটেই তো কথা। বিচার করার ক্ষমতাটাই আমাদের নেই যে। কামনা-বাসনা, লোভ, মোহ যদি বিচার করে জয় করতে পারতাম, তবে তো ল্যাঠা চুকেই যেত একেবারে!"

খানিক চুপ করে থেকে অলকেন্দু বলে, "শুধু চান্দ্রেয়ীর ব্যাপারটা নিয়ে ডিসকাস করব বলে তোকে ডাকিনি বিভাস। আর-একটা খবরও দেওয়ার আছে। এটা ব্রেকিং নিউজ বলতে পারিস। আমি আবার সম্ভবত বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছি। আগামী নভেম্বরের গোড়ায়।"

"বিয়ের পিঁড়িতে তো তুই কখনও বসিসনি অলক। তুই তো রেজিস্ট্রি

Be familiar with www.banglatorrents.com

করেছিলি আগের বার। মন্ত্র-ফন্ত্র বলা নাকি তোর আসে না?"

"তাতে কী? তাছাড়া বিয়েটা বাড়ির লোকেরাই আমাকে বলে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছে। সে আর এক কাহিনি..."

"পাত্রী কোথাকার?"

"বললাম তো, সে এক কাহিনি। বাকিটা আর-একটু এগোলে বলব।"

অতীত থেকে বিভাস ফিরে আসে ছুটে চলা রাস্তায়। বিলাসপুরের শহরাঞ্চল ছাড়িয়ে গাড়ি চলেছে মসৃণ রাস্তা ধরে। দু'পাশে ঘন নিবিড় গাছপালা। মাঝে-মাঝে জনপদ দোকানপাট আর খেতখামার। মাঝে-মাঝে দু'-একটা কারখানার শেডও দেখা যাচ্ছে। ছেলেবুড়ো দেহাতি লোক তার ছুটন্ত গাড়িটার দিকে কৌতূহলে তাকিয়ে আছে।

আজ সকালে ট্রেনে ঘুম ভাঙতেই বিভাস ট্রেনের জানলার গরাদে বিন্দু-বিন্দু জলকণা দেখে বুঝেছিল রাতে এদিকটায় বৃষ্টি হয়েছে। মাঠঘাট ও বাইরে সব ভেজা-ভেজা। এখন অবশ্য বৃষ্টি নেই। বেশ রোদ ফটফট করছে চারদিকে। গরমও লাগছে একটু। কলকাতার চেয়ে অবশ্য কম।

বেলা বারোটার একটু আগেই দময়ন্তীর কোয়ার্টারে পৌঁছে গেল সে। একটা পাটভাঙা ধনেখালি শাড়ি পরে বসে আছে দময়ন্তী। ডান হাতে চিরুনি, কপালে টিপ।

"কোথাও বেরোবে নাকি দময়ন্তী?"

বিভাসের অনুমান মিথ্যে নয়। সোফা-কাম-ডিভানটায় সে গা এলিয়ে বসতেই দময়ন্তী বলল, "আজ তোমাকে নিয়ে এক জায়গায় যাব।"

বিভাস ভুরু কোঁচকায়, "আমাকে নিয়ে? কোথায়? আমি কিন্তু কারও বাড়ি-টাড়ি যাব না।"

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলে, "কারও বাড়িতে নয়। আমরা যাব এখান থেকে আট-দশ কিলোমিটার দূরে। হাইওয়ে থেকে অনেকটা ভিতরে একটা ছোট নদী আছে, সেখানে। গাছপালায় ঘেরা বেশ মনোরম সেই জায়গা। তোমার সত্যি খুব ভাল লাগবে।"

বিভাস একটু হতাশ হয়ে বলে, "কোথায় এলাম তোমার সঙ্গে দু'দণ্ড নিরিবিলিতে বসে কাটাব বলে, আর তুমি কিনা এখন বলছ জঙ্গলে ঘুরতে!"

"সবুজ নির্জন অরণ্যে আমরা ঘুরব দু'জনে। সেটা কি খারাপ হবে?"

বিভাস হেসে ফেলে বলে, "না তা নয়। কখন বেরোবে?"

দময়ন্তী রান্নাঘর থেকে এক কাপ চা হাতে নিয়ে আসে। বলে, "ট্রেনে ব্রেকফাস্ট করেছিলে কি? কিছু খাবে এখন? সঙ্গে ভালমতো খাবার নিয়েছি টিফিন ক্যারিয়ারে। এখনও বেশ গরম আছে।"

একটু পরেই ওরা বেরিয়ে পড়ল।

দময়ন্তী দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে ভাল করে টেনেটুনে দেখল। বলল, "এখানে আজকাল চোরের উপদ্রব হয়েছে। দিনেরবেলায় পর্যন্ত চুরি হচ্ছে।"

"তারপরেও যে আজ সারাদিন বাইরে থাকার রিস্ক নিচ্ছ?"

"ওকথা ভাবলে তো ঘরবন্দি হয়ে থাকতে হয় রোজ। স্কুলেও তো যাই।... এই যে তুমি প্রায়ই আসো আর রাতেও আমার কাছে থাকো, এটাও তো একটা বড় রকমের রিস্ক। কী, তাই না?"

বিভাস এই কথার কোনও জবাব খুঁজে পেল না। সে আনমনে হাঁটতে লাগল দময়ন্তীর পাশাপাশি। দময়ন্তীর মাথার চুল পুরুষদের মতো ছোট করে ছাঁটা। দু'টি ফর্সা হাত একেবারেই নিরাভরণ। ডান হাতের মণিবন্ধে একটা হাতঘড়ি শুধু। ওর গলা বেষ্টন করে দুলছে একটা লকেট। এত কাছে এসেও দময়ন্তী কেন যে এত অধরা, তা বিভাস জানে না। অবশ্য যা কিছু দুর্লভ, তা পাওয়ার জন্যই মন ব্যাকুল হয়। সারাদিন হাতের কাছে সহজে পাওয়া বস্তু কী আকর্ষক হয়!

একটা লোকাল ভিড় বাসে চড়ে বেশ খানিকটা আসার পর তারা নামল। দময়ন্তীর একজন ছাত্রী বোধহয় দেখতে পেয়ে ওকে সিট ছেড়ে বসার জায়গা করে দিল। আশেপাশে দেহাতি সব মানুষ। জানালায় মুখ গলিয়ে বারবার থুতু ফেলছে। তাদের পায়ের কাছে রাখা মুরগি বোঝাই ঝুড়ি। একজায়গায় একটা বড়সড় সাপের ঝাঁপিও চোখে পড়ল বিভাসের। পাশেই বাঁশি হাতে সিটে বসে আছে মাথায় পট্টি-বাঁধা উদাস চোখের সাপুড়েটা।

বাস থেকে নেমে একটা রিকশা নিল ওরা। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় টলমল করতে-করতে এগিয়ে চলে রিকশা। বিভাস এই যাত্রাটিতে তেমন স্বস্তি পাচ্ছে না। কিন্তু দময়ন্তীকে দেখলে মনে হয়, সে বেশ উপভোগ করছে চারপাশের দৃশ্য। মাঝে পড়ল একটা ছোট কাঠের পুল। নীচে শুকনো নদী। রিকশাওলা টানতে পারবে না বলে দু'জনে নামল। পোল পেরিয়ে গিয়ে উঠল আবার দু'জনে। খানিকটা এগিয়ে বাঁক নিতেই সামনে বিস্তীর্ণ শস্যখেত একধারে। টেলিগ্রাফের তারে দোয়েল পাখি বসে আছে। আর প্রকৃতির ছন্দপতন ঘটিয়ে বেরসিকভাবে দূরে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বৈদ্যুতিক একটা সাবস্টেশন।

এইবার একটা নিবিড় গাছপালায় ঘেরা এলাকায় এসে ওরা থামল। সেখানে কাঠের দরজার গেট। গেট দিয়ে ঢুকে বিভাসকে নিয়ে দময়ন্তী এবার হাঁটতে লাগল। রিকশাচালককে বলাই আছে, সে অপেক্ষা করবে ওদের ফিরে না আসা পর্যন্ত। এটা কি রিজার্ভ ফরেস্ট জাতীয় কিছু? দময়ন্তী আজ বড় কম কথা বলছে। সব কথার উত্তর দিচ্ছে না।

পাঁচ সাত মিনিট কর্দমাক্ত মেঠো রাস্তা ধরে এগোতেই বিভাসদের চোখের সামনে যেন খুলে গেল অভাবনীয় এক দৃশ্যপট। গাছপালার নিবিড়তাকে ধরে রেখে একপাশে ঢালু উপত্যকা। ছোট-ছোট নুড়িপাথরের উপর দিয়ে রিমিঝিমি শব্দে বয়ে চলেছে একটি ক্ষীণকায়া নদী। দূরে দিগন্তরেখায় যে-টিলাটি দেখা যাচ্ছে, সেটাই বোধহয় এই নদীর উৎসস্থল।

ওর মুগ্ধদৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করে, "কী, জায়গাটা তোমার মনের মতো নয়?"

"অবশ্যই। দময়ন্তী এখানে আমরা আগে এতদিন আসিনি কেন বলো তো?"

"প্রথমত, এ জায়গাটা আমি সদ্য আবিষ্কার করেছি। আর দ্বিতীয়ত, এ জায়গায় দু'জনে আসাটা আজই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।"

"কেন?"

"সেটা আরও একটু পরে বলব। ফিরে যাওয়ার সময়।"

"আমার এখান থেকে মোটেই যেতে ইচ্ছে করছে না। কী অপূর্ব সুন্দর এই জায়গাটা!"

বিভাস ছেলেমানুষের মতো ছুটে গেল নদীর দিকে। যেতে-যেতে একটা নুড়ি কুড়িয়ে জোরে ছুড়ে দিল নদীর জলে। জলের দিকে তাকিয়ে থাকলে স্নিগ্ধতায় চোখ জুড়িয়ে যায়। নদীটা খুব চওড়া নয়। ওদিকেও এপাড়ের মতো শাল, মেহগিনি আর লম্বা ইউক্যালিপটাসের ঘন সমারোহ। কাছেপিঠে কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আকাশে মেঘ ও রোদ্দুর লুকোচুরি খেলছে। একসার বালিহাঁস উড়ে এসে বসছে নদীর জলে।

নদীর পাড়ের কাছে নলবনের সৃষ্টি হয়েছে। জলজ উদ্ভিদ ও শ্যাওলা ঘিরে মাছেরা ঘুরছে, উড়ছে ফড়িং। ছোট জলঢোঁড়া সাপও দেখা গেল দু' একটা। নদীর জল থেকে একটা আঁশটে গন্ধ উঠছে।

একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর এসে বসল ওরা দু'জন।

"এবারের পুজোসংখ্যার লেখাটা শুরু করেছ বিভাস?"

"শুরু করেছি বটে, তবে একফোঁটাও এগোচ্ছে না লেখা।"

"ওকথা বললে হবে? আমি কিন্তু মোটেও খুশি হইনি যখন তুমি আবার এখানে আসতে চাইলে। এটা তোমার ব্যস্ততার মাস। ভাবলাম ফোনে না করে দিই। তারপর ভাবলাম..."

"কী ভাবলে?"

"সেটা না হয় পরেই বলব, ফিরে যাওয়ার সময়।"

কথার থেকে ছড়িয়ে পড়ে কথা। প্রকৃতি, বিভাসের নতুন উপন্যাস নিয়ে কথা বলতে-বলতে কেটে যায় অনেকগুলো মুহূর্ত।

দময়ন্তী বেশ কয়েকখানা লুচি আর পনিরের তরকারি তৈরি করে নিয়ে এসেছে। আর দুটো মিষ্টি।

খাওয়ার শেষে জল খেতে-খেতে বিভাস বলল, "আগে জানা থাকলে কয়েকটা বিয়ারের বোতল কলকাতা থেকেই সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম। তোমার বাড়িতে তো তুমি অ্যালাউ করবে না। তাই কখনও আনি না।"

"আনলেই তো পারতে। আমিও একটু খেতাম না হয়।"

বিভাস চোখ বড়-বড় করে বলে, "তুমি খাবে? তাহলে ফেরার পথে চকবাজারের মোড়ের কোনও হোটেলে গিয়ে খোঁজ করে দেখি।"

"আচ্ছা আচ্ছা, সে না হয় হবে। এখন আমার একটু ঘুম পাচ্ছে। উঠবে নাকি এবার?"

বিভাস অনুনয়ের সুরে বলে, "আর একটু থাকি। এক কাজ করো। তুমি এইখানে না হয় একটু রেস্ট নাও। আমি চারপাশটা ঘুরে আসি। প্রকৃতিকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হয়, তবেই নানা রূপে সে ধরা দেয়।"

বিভাস এগিয়ে যায় নদীর সমান্তরাল হয়ে বেশ অনেকটা। এক জায়গায় একটু বাঁক মতো ঘুরতেই আর দময়ন্তীকে দেখা গেল না। গাছপালা আর বাঁকের আড়ালে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বিভাস চারপাশটায় সতর্ক চোখে দেখে নিল কয়েকবার। নদী আপনমনে বয়ে চলেছে। দূরের পাহাড়টাও এখন অদৃশ্য। নদীর ওপাড়ে শুধু ঘন জঙ্গল। সবুজ গাছপালা, নীল আকাশে সাদা মেঘ, জলের উপর ভাসমান সাদা খয়েরি রঙের গোটাকয়েক বালিহাঁস। এই দৃশ্য থেকে চোখ ফেরাতে যেন ইচ্ছে করে না আর।

বিভাসের মাথায় কী এল হঠাৎ। সে এক-এক করে তার গায়ের সব পোশাক খুলে ফেলে একেবারে নগ্ন হয়ে গেল। তারপর ছুটে-ছুটে নেচে-নেচে উল্লাস করতে লাগল। হাততালি দিয়ে উঠল জোরে। গান গেয়ে উঠল


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

মনের আনন্দে। একবার পাথরের নুড়ি পেরিয়ে নদীর জল স্পর্শ করে মাথায় ছেটাল। একবার ছোট নুড়ি তুলে ছুড়ে মারল নদীর জলে। তাকে যেন আজ ভূতে পেয়েছে। নদীর জলে কয়েকবার ডুবও দিল সে। তারপর এসে একটা বড় কালো পাথরের উপর বসে ভিজে গা শুকোতে লাগল। "ম্যাকেনাস গোল্ড'-এর ওমর শরিফ-এর মতো!

বেশ খানিকটা সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎদময়ন্তীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "এই বিভাস তুমি কোথায়? বেলা হল, যেতে হবে না এবার?"

বিভাস একটা গাছের আড়ালে থেকে গলা তুলে বলে, "বিয়ার না খেয়েও আমার নেশা হয়ে গিয়েছে দময়ন্তী। আমি এখন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার কোনও লজ্জা করছে না। এবং তোমার যদি সেরকম কোনও বাধা না থাকে, সামনে আসতে পার।"

"কী যা তা বলছ বিভাস! পুরুষকে নগ্ন দেখতে আমার অশ্লীল লাগে।"

"মনের মতো পুরুষকেও দময়ন্তী?"

"সে ঠিক আছে। কিন্তু সে তো তুমি নও।"

বিভাস বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। নেশাটেশা সব মুহূর্তে কেটে যাচ্ছে যেন। সে দ্রুত পোশাক পরে দময়ন্তীর সামনে এসে দাঁড়াল।

"তবে সে কে? কে, দময়ন্তী? বলো, তোমাকে বলতেই হবে। এখনই।"

বিভাস ছুটে এসে দময়ন্তীকে ধরে প্রথমে ঝাঁকাতে লাগল। তারপর ওর মুখটা টেনে আনল নিজের মুখের খুব কাছে। শরীরের উষ্ণতায় উত্তেজনায় তার দুটো ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে তখন।

দময়ন্তী ওর বেষ্টনী থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "প্লিজ় বিভাস, বিহেভ ইয়োরসেল্‌ফ। আমাকে এভাবে অপমান কোরো না।"

"চুম্বন তোমার কাছে অপমান মনে হচ্ছে?"

"বাধ্যতামূলক চুম্বন আর বলাৎকারের মধ্যে কোনও তফাত নেই বিভাস। চলো ফিরব এখন। পাগলামি কোরো না।"

"কোথায় যাব এখন আমরা?"

"প্রথমে যাবো শালডমরুতে, আমার কোয়ার্টারে। তারপর সেখান থেকে রাত দশটায় একটা ট্রেন ধরে তোমাকে আজ ফিরে যেতে হবে কলকাতায়। তোমার ট্রেনের টিকিট আমি রিজার্ভেশন করে রেখে দিয়েছি। আর একটা কথা, আর কখনও তুমি আমার কাছে এসো না। এলেও আমাকে পাবে না।"

বিভাস বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ধীরস্বরে বলে, "হঠাৎ এত বড় শাস্তিটা আমাকে কেন দিলে দময়ন্তী?"

"হয়তো তোমাকে সত্যি খুব ভালবাসি বলে। কিন্তু আর কোনও প্রশ্ন করো না প্লিজ়..."

আজ পাঁচ-ছ' বছর ধরে যে-সম্পর্কটা মনের মতো করে গড়ে উঠেছিল, তার নীচে চোরাবালি তৈরি হয়েছে, বিভাস তা টেরও পায়নি। হঠাৎ দময়ন্তীর এই সিদ্ধান্ত কেন? কেন এত আকস্মিক? অনেক ভেবেও ধরতে পারছে না বিভাস। সে প্রায় দু'মাস বিলাসপুরে দময়ন্তীর কাছে আসেনি। তারই মধ্যে কখন এই ভাঙচুর হয়ে গেল, আর কেনই বা হয়ে গেল, কে তা বলে দেবে? এমন অতর্কিত আঘাত সে কল্পনাও করেনি। একঘণ্টা আগেও কিছু আঁচ করেনি। দময়ন্তী তার সঙ্গে কৌতুক করছে না তো?

প্রকৃতির সেই নয়নাভিরাম পরিবেশ থেকে সন্ধের অনেক আগেই তারা ফিরে এসেছিল দময়ন্তীর কোয়ার্টারে। ফিরে এসে দময়ন্তী যখন বাথরুমে স্নান করতে ঢুকল, তখন বিভাস কৌতূহলবশে এসেছিল ওর বেডরুমে। তীক্ষ্ণ চোখে সারা ঘরটা একবার জরিপ করতে গিয়ে তার চোখে পড়েছিল দময়ন্তীর বালিশের পাশে স্লিপিং পিলের আস্ত একটা ফয়েল। দ্রুত ফিরে এসে সে আবার বসে পড়েছিল বাইরের ঘরের সোফাটায়। দময়ন্তী কি অসুখী?

রাত আটটা পর্যন্ত দময়ন্তী কোনও কথা বলেনি। বিভাসের ভেঙে পড়া ভাব দেখেও সে টলেনি। কোনও কাকুতিমিনতিতে কাজ হয়নি।

একজন নারীর কাছে একজন পুরুষের যতখানি দুর্বল হওয়া সাজে, যতখানি নিজেকে মেলে ধরা যায়, তার চেয়েও বেশি চেষ্টা করল বিভাস। কিন্তু বৃথাই। দময়ন্তী মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। অবশ্য খুব যত্ন করে পাশে বসে তাকে খাওয়াল দময়ন্তী। আজ অনেক পদ রান্না করেছে। তবু বিভাসের গলা দিয়ে ভাত নামছিল না। সে খাওয়ার কসরত করে যেতে লাগল কষ্টে।

এরই মাঝে দময়ন্তী হঠাৎ বলে উঠল, "বিভাস, তুমি তোমার লেখা নিয়ে যে যন্ত্রণায় ভোগো, তা তোমায় লেখক হিসেবে অনেক দূর নিয়ে যাবে। শুধু বলি, তুমি তোমার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর জন্য যেরকম একাত্মতা অনুভব করো, তার একভাগ অন্তত তোমার পরিবারের সকলের জন্যও অনুভব করো। দেখো, মানুষ হিসেবে তুমি আরও মহৎ হয়ে উঠবে।"

বিভাস শুকনো হেসে বলেছিল, "তুমি কী ইদানীং বাংলা সাহিত্য ছেড়ে সমাজতাত্ত্বিক হয়ে উঠতে চাইছ দময়ন্তী?"

দময়ন্তী একথারও কোনও উত্তর দেয়নি।

উত্তরহীন অজস্র প্রশ্ন ক্রমশ বুকের মধ্যে পাহাড় হয়ে উঠছে। সেই দুঃখ যন্ত্রণার দুঃসহ ভার বুকে নিয়েই স্টেশনে এসে রাত দশটার ট্রেনে উঠে পড়ে বিভাস। সিটে বসে জানলা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকায়।

ততক্ষণে ট্রেন চলতে শুরু করে দিয়েছে। কিছু বোঝা যায় না। সব কেমন ঝাপসা ও অন্ধকার লাগে। শুধু অনেক অনেক উপরে আকাশের তারারা কেবল নিঃশব্দে থরথর করে কাঁপে।

**ছোট প্রাপ্তি, বৃহৎ সংগ্রাম**

একের পর এক অন্ধকার কালো মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ। ঋষভের জীবনে এরকমটা যে এর আগে কখনও হয়নি তা নয়। বহুবারই হয়েছে। তবে চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তায় সেসব সমস্যার সমাধান করতে তার খুব একটা দেরি হয়নি। কিন্তু এবার সমস্যাগুলো সব ব্যক্তিগত আক্রমণ, ব্যক্তিগত দুর্যোগ। সেই দিল্লি থেকে ফেরার পর থেকেই এরকম শুরু হয়েছে। মনে হয়, সেদিনের সেই সকালের প্লেন দুর্ঘটনায় পড়াটা ছিল এসবেরই অশনি সঙ্কেত।

মায়ের চিকিৎসা সঠিক পথে চলছে, এই যা ভরসা। ক্যানসারের রোগী বাঁচবে না ঠিকই, কিন্তু মা যেন আরও কয়েকটা দিন তাদের সঙ্গে থাকেন এবং কষ্টটা যেন কম হয় তাঁর। কলকাতার এক নামী ক্যানসার স্পেশ্যালিস্ট দেখছেন মাকে। ঋষভকে তিনি ভরসাও দিয়েছেন খানিকটা।

তিথি আর অম্বরীশ গতকাল ফিরে গিয়েছে আমেরিকা। ফিরে যাওয়ার সময় দাদার সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল তিথি। মাকে বোধহয় তাদের এই শেষ দেখা। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই এখন ওখানকার গ্রিনকার্ড হোল্ডার এবং একটি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্কুলের টিচার। এই পেশায় সম্মান আছে ওখানে, তবে ততটা উপার্জন নেই। তাই যাওয়ার সময় তিথি আর অম্বরীশ মায়ের অসুখের জন্য কিছু ডলার ঋষভকে দিতে গেলেও সে নেয়নি। বাবা সুকুমার মিত্র হিসেবি মানুষ। তাঁর সঞ্চয় ভালই। তাছাড়া বাঁধা একটা মাসিক পেনশনও আছে তাঁর। কিন্তু সোমার রাগারাগিতে ঋষভ বাবার কাছ থেকেও টাকা নেয়নি। নিলে একটু হয়তো সুবিধে হত। ঋষভকে অনেক ট্যাক্স দিতে হয়। অনেক ঘুষও দিতে হয়।

জিৎ তার ঠাম্মা আর দাদুকে তেমন চেনে না। দু' বছর বয়স থেকেই সে মা-বাবার সঙ্গে চলে এসেছে আলাদা ফ্ল্যাটে। তবু ঠাম্মার অসুখ শুনে সে নিজেই চলে আসবে। ঠাম্মাকে দেখে যাবে। সোমার মুখে এই খবরটা পাওয়া ইস্তক ঋষভ যেন মরুভূমিতে ওয়েসিস দেখতে পাওয়ার আনন্দ অনুভব করছে। কতদিন দেখেনি ছেলেকে। সে আসবে জেনে মনের মধ্যে একটা আনন্দময় প্রত্যাশা জেগেছে।

আসলে ছেলে, স্ত্রী বা পরিবারের কাউকে নিয়েই গত দশ বছরে কিছুই ভাবেনি ঋষভ। শুধু ব্যস্ত ছিল তার কাজ নিয়ে। একটা দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে ধাপে-ধাপে কেবল উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। সিঁড়ির নীচের ভুলভ্রান্তি ব্যর্থতা, অতৃপ্তি কিছুই কখনও তার চোখে পড়েনি। কিংবা পড়লেও প্রশ্রয় দেয়নি।

অনেকদিন আগে মা তাকে একটা কথা বলেছিলেন। তখনো ঋষভের বিয়ে হয়নি। সেই সময় তার চাকরিতে একটা বেশ বড় প্রোমোশন হয়। বাবা-মা খুবই খুশি নিঃসন্দেহে। শুধু মা একসময় তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, "তোকে কিন্তু এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। ছোট-ছোট পাওয়াগুলো মানুষকে আরও বড় কিছু পাওয়ার সংগ্রাম থেকে দূরে নিয়ে যায়। মানুষ সব সময় পার্থিব সুখ উল্লাস নিয়ে মত্ত থাকে, আর আটকে যায় সেখানেই। মহৎ কোনও সত্যকে খোঁজার চেষ্টা করে না।"

মা আরও বলেছিলেন, "মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে আমাকে পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলা উপজেলায় ঘুরতে হয়েছে। দেখেছি এই বাংলার আসল চেহারাটা ঠিক কী। শহরের মানুষ তা কল্পনাও করতে পারবে না। সবাই হয়তো তথ্য হিসেবে জানে যে, ভারতের কত কোটি লোক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। কিন্তু ঠিক কীভাবে কত দুঃসহ কষ্ট সয়ে যে তারা বাস করে, তা অনেকে অনুমানই করতে পারবে না। দেখেছি বন্যার সময় গাছের মগডালে বসে দিনের পর দিন না খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে কত মানুষ। একটাই রুটি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে দু'দিন ধরে খাচ্ছে। দেখেছি আন্ত্রিক রোগে বিনা চিকিৎসায় অবহেলায় মরে যাচ্ছে কতশত লোক। পলিটিক্যাল পার্টির লোকেরা এদেরই নানা ছুতোয় খেপিয়ে দেয়। এদেরই ভোটের সময় কাজে লাগায়। কিন্তু মানুষগুলোর কিন্তু কোনও উন্নতি হয় না। তবে হাতে গোনা

Be familiar with www.banglatorrents.com

দু'-একজন মানুষও অবশ্য এখনও গ্রামেগঞ্জে আছে, যারা নিঃস্বার্থভাবে এবং গোপনে পরের সেবা করে যায়। আর তার বদলে যেটা পায় সেটা হল, মানুষের আন্তরিক ভালবাসা। শুনতে ছেঁদো লাগলেও এটাই খাঁটি সত্য।"

এই তার মা যিনি আজ মৃত্যুপথযাত্রী। অথচ এই কঠিন দুরারোগ্য অসুখেও মানুষটি যে এখনও কত স্নেহপ্রবণ তা বলা যায় না। প্রত্যেকটি মানুষের দিকে তাঁর ভালবাসার দৃষ্টি। আজ সকালেও সে মাকে দেখে এসেছে। সোমা তো দু'দিন অন্তর যায়। নার্স রাখা হয়েছে, তবু সোমা সবটা নার্সের ওপর ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে না।

ঋষভের সঙ্গে সোমার প্রায়শই ঝগড়াঝাঁটি হয়, কিন্তু তার এই মানসিক অস্থিরতার মুহূর্তে আশ্চর্যজনকভাবে আজকাল সোমার কথাই বেশি মনে পড়ে। মনে হয়, ওর সঙ্গে বসে সমস্যাগুলো শেয়ার করলে মনটা হয়তো একটু হালকা হবে। ও হয়তো ঋষভের পাশে এসে দাঁড়াবে।

তার ভুলটা অবশ্য ভেঙে গেল খুব শীঘ্রই।

সেদিন সকালবেলা জিম থেকে ফিরে ড্রইংরুমে বসে খবরের কাগজ খুলে বসেছে, সোমা এসে বসল উল্টোদিকের সোফাটায়। ওর হাতে বেশ বড় সাইজের একটা ডায়েরি বা নোটবুক। সোমা কথা বলছে না। শুধু পাতা উল্টে যাচ্ছে। খানসামা গুরুদাস টেবিলে চায়ের ট্রে রেখে গেছে, কিন্তু অন্য দিনের মতো সোমা কাপে চা ঢেলে দিল না। মনোযোগ দিয়ে তখনও সে ডায়েরিটাই দেখছিল। জিম থেকে ফিরলে শরীর ও মন দুই-ই বেশ কিছুক্ষণ ঝরঝরে থাকে। তাই তেমন রাগ হচ্ছে না বটে, কিন্তু বেশ অবাক লাগছিল ঋষভের।

"চা দেবে না?"

"হ্যাঁ দিচ্ছি। আচ্ছা এই ডায়েরিটা দেখে তোমার কিছু মনে পড়ে?" সোমা সোফার উপর খোলা ডায়েরিটা উল্টে রাখতে-রাখতে বলল।

ঋষভ একটু নিবিষ্ট মনে সেদিকে তাকিয়ে বলে, "আমাদের বাড়ি থেকে পেয়েছ, তাই না?"

"হ্যাঁ। মায়ের বিয়ের পরের ডায়েরি। তোমার ছেলেবেলার অনেক কথাও এতে লেখা আছে। বাবা, কী বিচ্ছুই না ছিলে তুমি! পড়ে দেখো এখানটা..."

"তুমি পেলে কোথা থেকে? যতদূর জানি, ওটা আলমারিতে তোলা ছিল। আমি আর তিথি ওটা বের করে পড়তে গেলেই মা লজ্জা পেয়ে কেড়ে নিত আমাদের হাত থেকে। লজ্জায় কেন জানি না একেবারে লাল হয়ে উঠত মায়ের মুখটা।"

চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে সোমা বলে, "দাঁড়াও তোমাকে একটা জায়গা পড়ে শোনাই। খুব মজা পাবে। মা লিখেছেনও ভারী চমৎকার করে। তোমার বন্ধু বিভাসকে এটা পড়ালে উনি ঠিক বুঝতেন। তোমার তো রসকস নেই..."

"ছিল সোমা। এখন বোধহয় সব শুকিয়ে গেছে।"

"যাবেই তো। তুমি তো নিজেকে একখানা টাকা তৈরির মেশিন ছাড়া আর কিছু বানাতে চাওনি। মেশিন থেকে কি ওসব বেরোয়?"

"তুমি হয়তো ঠিকই বলছ সোমা। আজ আমি সত্যিই নিপুণ একটা যন্ত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছি। সুইচ অফ না করে দিলে আমি থামব না।"

"তাহলে নিজেকে এতদিনে চিনতে পারছ?"

"এতদিনেও চিনতাম না। কিন্তু সামনে...সামনে আমার বড় বিপদ সোমা। আমি নানা ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। বিপদের দিনেই মানুষ বোধহয় তার ভুল বুঝতে পারে। তুমি আমার সব কথা একবার শুনবে?"

"বিপদ! হ্যাঁ, সে তো আমাদের পরিবারের সত্যিই ঘনিয়ে এসেছে। মা যে আর বেশিদিন আমাদের মধ্যে থাকবেন না এটা তো মেনে নিতেই হচ্ছে। আর সেটা যে কী নিদারুণ সত্য..."

"সোমা, শুধু সেটাই নয়। এর ওপর অফিসে আমাকে নিয়ে একটা জোর কনস্পিরেসি চলছে। আমার সিদ্ধান্ত বা নির্দেশগুলো কেউ আর গ্রহণ করছে না। গ্রাহ্য করছে না। আমি এগোতে পারছি না!"

"আবার তুমি সেই অফিস শুরু করলে? আর কি কিছু কথা নেই?"

"সোমা, আমাকে দশ-বারো ঘণ্টারও বেশি সময় কাটাতে হয় অফিসে। আর সেখানে সব সময় ভীষণ টেনশন, নানারকম সমস্যা। সব কিছু ভুলে গায়ে একেবারে না মেখে থাকা যায়? আই অ্যাম টায়ার্ড। র‍্যাদার আই অ্যাম স্কেয়ারড। কী করে বাঁচি বলো তো এর থেকে? আমি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছি ভেতরে-ভেতরে। আই অ্যাম অন দি ওয়েন।"

"সরি ঋষি, তোমার অফিসের টেনশন নিয়ে তুমিই থাকো। আমার ও ব্যাপারে একটুও আগ্রহ নেই। তাই তোমার অবস্থাটা ফিল করতে পারছি না। প্লিজ আমার কাছে এসব বলতে এসো না আর।"

কথাটা শেষ করতে-করতে সোমা চা ঢেলে দিয়েই উঠে গেল। আর এসে বসল না। গুরুদাস জানে সকালের ব্রেকফাস্ট কেমন হবে। কখন সেটা দিতে হবে। ওকে বলে দেওয়ার বা দেখানোর কিছু নেই। তবু সোমা চলে গেল। যেন ওর কিচেনে এখন কত কাজ।

সেদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে আর কোনও কথা হল না। পরিজ, টোস্ট, দু'-এক টুকরো আপেল এবং এক কাপ কফি খেয়ে অফিসে বেরিয়ে পড়ল ঋষভ। গাড়ি থিয়েটার রোডে ঢুকছে সবে, তাঁর ফোন বেজে উঠল। অরবিন্দ রায়। এ সময়ে তো কখনও উনি ফোন করেন না। কী হল আবার?

কানে মোবাইল ধরে ঋষভ বলে, "গুড মর্নিং স্যার।"

"মর্নিং ঋষভ। অফিসে আছ তো আজ? নাকি মিটিংয়ে বেরিয়ে যাবে?"

"না স্যার, সারাদিনই আছি। নয়ডার একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করা হয়েছে। আর একটা থ্রি-ডি অ্যানিমেশন। ওগুলো দেখব আমরা আজ বোর্ডের সবাই।"

"আমাকে বাদ দিয়ে কেন?"

"স্যার, এটা প্রিলিমিনারি স্টেজ। আপনার কাছে যাব আর একটু পরে। আর একটু ফাইনাল করে।"

"না, পরে নয়। নয়ডার প্রজেক্টটা তোমাকে বাদ দিতে হবে। ফোনে সব কথা হয় না। আমি অফিসে আসছি বারোটা নাগাদ। তোমরা থেকো।"

ঋষভ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে তার। তবু চেয়ারম্যান বলে কথা। ভদ্রতার খাতিরে তাই ঋষভকে জিজ্ঞেস করতেই হয়, "স্যার লাঞ্চ করবেন তো আমাদের সঙ্গে?"

"অফ কোর্স!"

"চয়েস আছে কিছু স্যার?"

"জানোই তো, বাড়িতে কীরকম কড়াকড়ি আমার। তাই বাইরে বেরোলে আমি কিছুই মানি না। যদিও সেটা তোমাদের ম্যাডাম ধরে ফেলে। মুখে কিছু বলে না। শুধু কলকাতায় যখন থাকে তখন আমার বাইরে বেরনোটা বেশ কন্ট্রোল করে রাখে। তুমি বরং চাইনিজ কিছু আনিয়ে নিতে বলো।"

"ওকে স্যার।"

নয়ডার প্রজেক্টটা বাদ দিতে হবে! কিন্তু কেন? ঋষভ গুম হয়ে বসে থাকে গাড়িতে। সুখলাল থিয়েটার রোডের জ্যামে পড়ে অধৈর্য হয়ে ঘন-ঘন হর্ন বাজাচ্ছে। তবে স্যারের ফোনের কথাবার্তা সে গাড়ি চালাতে-চালাতেই কান পেতে শোনে। কিছু-কিছু কথা অসতর্কভাবে অন্য ড্রাইভার বা অফিসারদের সামনে ফাঁস করেও দেয়। যদিও বুঝতে পারে কাজটা করা তার উচিত হয়নি। তখন মনে-মনে জিভ কাটে। তবু পেট-পাতলা মানুষ সুখলাল শেষ পর্যন্ত গুহ্য কথা একটু অন্তত কাউকে না বলে দিয়ে থাকতে পারে না।

এই তো গত বছর শেয়ার বাজারে ধস নামাতে স্যার কীরকম বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, ঘন-ঘন ফোন করছিলেন দালালদের। তাঁর প্রায় সাড়ে পাঁচ ছ' লাখ টাকা লস হয়েছিল। একথাটা সবাই অফিসে সুখলাল মারফতই জেনেছিল। তাছাড়া এবছর পুজোয় কত বোনাস হবে, ওভারটাইমের রেট বাড়ছে কিনা, কোন সেকশনে কার প্রমোশন হবে, কার চাকরি যাবে, কে ট্র্যান্সফার হবে তা সুখলালের পেট খোঁচালেই জেনে যাওয়া যায়। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের লোকজন সব তাই সুখলালকে একা পেয়ে গেলে নানাভাবে পটায় আর অফিসের যত তথ্য সব জেনে নেয়। সুখলাল অবশ্য জানে যে এসব জরুরি তথ্য ফাঁস হওয়ার খবর সাহেবের কানে চট করে পৌঁছবে না। তিনি অন্য জগতের লোক।

ঐশী চ্যাটার্জি অনেকগুলো ফোন-কল আর মেসেজ রিসিভ করেছে সকাল থেকে। ঋষভের কামরার লাগোয়া একটি অ্যান্টিরুমে সে বসে। সামনের কাচের দরজাটা বন্ধ থাকে। হঠাৎ সেটি খুলে ভিতরে প্রবেশ করার সাহস খুব কম লোকেরই আছে এই অফিসে। কেউ ঋষভের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, তবে সে তার ডিপার্টমেন্ট থেকে ইন্টারকমে ঐশীর কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নেয়। ঋষভ কাউকে নিজেই ডেকে পাঠালে অবশ্য অন্য কথা। ব্যতিক্রম একমাত্র চেয়ারম্যান সাহেব। তিনি যখন-তখন এসে পড়েন এ ঘরে। ঐশীকে ডিঙিয়ে ঢুকে যান স্যারের কামরায়।

ওই কামরার লাগোয়া একটা মিনি কনফারেন্স রুম আছে। চেয়ারম্যানের তলব পেয়ে সেক্রেটারি অতীশ, কাশীনাথ সাহেব এঁরাও সব এসে পড়েন। কনফারেন্স রুমে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়।

আজও একটা ছোটখাটো মিটিং হচ্ছে। এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টররা প্রায় সকলেই উপস্থিত। অতীশ রায় চৌধুরী মিনিটও লিখে ফেলছেন। অথচ ঐশী জানে, এই মিটিংটা মোটেও পূর্ব-ঘোষিত নয়। একেবারেই অচমকা। ঐশী লক্ষ করেছে, আজ বসকে ভীষণ গম্ভীর ও চিন্তান্বিত লাগছে। ওঁর মায়ের শরীর কি বেশি খারাপ হয়েছে?

ইদানীং স্যার একটু বদলে গিয়েছেন। নিজেকে গুটিয়ে রাখছেন। ঐশী যেটুকু আঁচ পেয়েছে, তাতে বুঝতে পেরেছে নয়ডার প্রজেক্টটা নিয়ে কোনও একটা সমস্যা গজিয়ে উঠেছে। তারপর ওঁর মায়ের অসুখ তো আছেই।

ঐশী ভাবতে থাকে, আজ ঋষভ সারাদিনে কী-কী করেছেন। অফিসে


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

এসেই প্রথমে নয়ডার করেসপন্ডেন্স ফাইলটা চেয়ে পাঠালেন। তারপর ঘরের বাইরে লাল আলোটা জ্বেলে দিয়ে ভিতরে বসে ছিলেন কিছুক্ষণ। একটাও ফোন-কল অ্যাটেন্ড করেননি। হঠাৎই সাড়ে বারোটা নাগাদ এই মিটিংয়ের ঘোষণা। লাঞ্চের অর্ডারটা কী হবে, এর মধ্যে নোট করে নিয়েছিল ঐশী।

প্রায় দুটো পর্যন্ত চলল মিটিং। লাঞ্চও হল। ঋষভ যে কতখানি চিন্তিত, সেটা বোঝা গেল তার খাবারের প্লেটটা দেখে। যেটুকু নিয়েছিল তার প্রায় অর্ধেকটাই প্লেটে পড়ে আছে।

বেয়ারা রহমত ফিসফিসিয়ে ঐশীকে জিজ্ঞেস করে, "ব্যাপার কী ম্যাডাম? সাহেবের শরীর ভাল নেই? খাবার তো সব প্লেটে পড়ে আছে!"

ঐশী খানিকক্ষণ পরে কাগজপত্র একটু গুছিয়ে, ঋষভের কামরায় ঢুকল, "স্যার, হঠাৎ বিনা নোটিসে আজ মিটিং? এর আগে তো কখনও এরকম...।"

"এখন থেকে এরকম অনেক কিছুই দেখবে ঐশী। হয়তো এমনও একদিন দেখবে, আমার এই চেয়ারটায় অন্য কেউ বসে আছে। আমি নেই।"

একথার ঐশী কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু সে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে।

ঋষভকে দিয়ে কিছু কাগজপত্র সই করানোর জন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ঐশী। সেগুলো টেবিলে রাখতে-রাখতে বলল, "স্যার একটা কথা বলব?"

"বলো।"

"রাগ করবেন না তো?"

"না, করব না।"

ঐশী মাথা নিচু করে কাগজগুলো উল্টে দিয়ে ঋষভকে সাহায্য করছিল সই করতে। মুখ তুলে বলল, "অফিসের কাজের বাইরে একটু সময় বের করার চেষ্টা করুন না! দেখবেন, যে-জগৎ নিয়ে আপনি মশগুল থাকেন, তার বাইরে আরও অনেক কিছু আছে, যা থেকে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়।"

"তুমি আমাকে জ্ঞান দিচ্ছ? ইউ বেটার গেট আউট ঐশী।"

"আমার কথা আপনার ভাল লাগছে না, তাই তো?"

"আমার কারও কথাই ভাল লাগছে না।"

সই শেষ করে চেয়ারে হেলান দিল ঋষভ। বলল, "আই অ্যাম লস্ট। টোটালি লস্ট অ্যান্ড ডিফিটেড। নয়ডা প্রজেক্টটা চেয়ারম্যান সাহেব বাতিল করে দিতে বলেছেন। আর বোর্ডের সকলে এক কথায় সায় দিয়েছে তাতে।"

"স্যার, ওটা তো আপনার একটা মিশন ছিল, আপনার স্বপ্ন ছিল!"

"সব ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে।"

সেদিন একটা ঘোরের মধ্যে ঋষভ ঐশীকে একান্ত করে পাওয়ার দৃশ্য কল্পনা করেছিল, আজ মনে হল, সেটা এখন বাস্তব হোক। সে বাস্তবতার মধ্যে অনেক সান্ত্বনা আছে, অনেক পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তি আছে। এটাই সেই আলাদা জগৎ যেখান থেকে ঋষভ অনেকদিন হল মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ঐশী তাকে টানছে।

সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পূর্বমুহূর্তে ঐশী যে-চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল, আজও সেই একই স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সেই ভ্রূপল্লবের ডাক যে চন্দনের বনে নিয়ে যায়, মায়াহরিণের মতো তা বোঝার বোধবুদ্ধিটা আজ ভোঁতা হয়ে গেছে ঋষভের।

আজ মনে হচ্ছে, এক বাজিকর তার মনে ডুগডুগি বাজাচ্ছে। ঋষভ স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। কারণ সে রসের কারবারি নয়। কিন্তু কেন যেন আজকাল ঐশীর সান্নিধ্য খুব ভাল লাগছে। একদিন ঘুমের মধ্যে স্বপ্নও দেখেছে ঐশীকে। স্বপ্নের ঘোরে বীর্যপাতের পর বাথরুম থেকে ঘুরে এসে নিদ্রাহীন চোখে অনেকক্ষণ ঐশীর কথাই মনে পড়েছে। পাশেই কাত হয়ে শুয়ে আছে সোমা। বহুকাল ও শরীর দেয় না। আর ঋষভেরও কামনা জাগে না। সারাদিন মাথার মধ্যে কাজ আর কাজ। তার মধ্যে রিল্যাক্সেশন বলতে মদ আর কখনও বা ডিস্কোথেক। এবার নারায়ণদার সঙ্গে গিয়ে একদিন শোভা দত্তর ফ্ল্যাট দেখে আসতেই হবে। দেখতে হবে নরম তোয়ালে দিয়ে শোভা দত্ত কপালের ঘাম মুছে দিলে সেই সঙ্গে পরাজয় আর অপমানের জ্বালাও মুছে যায় কি না!

নয়ডার প্রজেক্টটা শেষ পর্যন্ত হচ্ছে না। তার পরিচিত বিজনেস হাউসের লোকজন, বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা, বন্ধুবান্ধব, অফিসের অধস্তন কর্মচারী, প্রত্যেকে তাকে এইবার মনে-মনে দুয়ো দেবে। তার ইমেজ নষ্ট হয়ে যাবে। মাটিতে ধুলোয় লুটোবে।

"ওফ!" শিউরে উঠল ঋষভ।

"কী হল স্যার? এনি প্রবলেম?" একটু এগিয়ে এল ঐশী।

"নাথিং। কিছু হয়নি। আমি বেশ ভাল আছি।"

"না স্যার। আপনি ভাল নেই। আপনার খুব মেন্টাল স্ট্রেস যাচ্ছে। আপনি আজ বরং আর অফিস করবেন না।"

ঋষভ অবাক চোখে বলে, "অফিস করব না! কেন? তুমি বলছ বলে?"

"যদি বলি তাই? আমার কথা আপনি শুনবেন না?"

এই কথায় যে যাদু আছে সেটা সম্মোহিত করে ফেলল ঋষভকে। অফিস থেকে চারটের আগেই বেরিয়ে পড়ল ঋষভ। সঙ্গে ঐশী। অফিসের বেশ অনেকেই লিফটে তাদের একসঙ্গে নামা, নীচে বেসমেন্টে পৌঁছে গাড়িতে উঠে পাশাপাশি বসা, সবই দেখল। সংবাদটা ছড়িয়ে পড়বে নির্ঘাত।

ক্যামাক স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে গাড়ি থিয়েটার রোড ধরে এগোচ্ছে। তারপর প্ল্যানেটারিয়ামের পাশ ধরে একেবারে রেসকোর্সের সামনে এসে পড়তেই ঐশীর মনে হয়, তারা কোথায় যাচ্ছে? স্যার কি তাকে নিয়ে গঙ্গার জেটির ধারে বসবেন প্রেমিক-প্রেমিকার মতো? নাকি কোনও রেস্তোরাঁয় খাওয়াবেন?

এতক্ষণ এলোমেলো কিছু কথা হয়েছে। তবে ঋষভ ঐশীর হাত ধরেনি একবারও, ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেনি। সুখলাল ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বাড়ি যাবেন কি স্যার?"

ঋষভ যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, বাড়িই যাব। তবে আমার নয়, ম্যাডামের বাড়ি।"

ঐশী যথেষ্ট অবাক হয়ে বলে, "আমার বাড়ি তো এদিকে নয়।"

"তবে কোথায়?"

"কড়েয়া রোড, পার্ক সার্কাসের কাছে।"

"আগে বলবে তো সেটা।"

"আপনি তো জানেন আমার বাড়ি কোথায়!"

ঐশীর একটু রাগ হল। এ আবার কী কথা? স্যার পাগলামির ঝোঁকে কী করবেন, কোথায় যাবেন না যাবেন, সে তা জানবে কী করে! তবে সে রাগটা গোপন করেই বলে, "আমি এখানে নেমে পড়ছি স্যার। আমার কোনও অসুবিধা হবে না। সুখলালজি, গাড়িটা একটু থামাবে?"

"আরে, সে কী হয়? তোমাকে আইসক্রিম খাওয়াব, ছোলা-বাটোরা খাওয়াব। আমারও খুব খিদে পেয়েছে। সুখলাল, চলো নিউ আলিপুরের সুপার স্ন্যাক্স-বারে। আগে গিয়েছ কখনও ওখানে ঐশী?"

"যাইনি। তবে ফোন করে আপনার গেস্টদের জন্য অনেকবার খাবারের অর্ডার দিয়েছি।"

"দ্যাট্স ইট।"

রেস্তোরাঁটি থেকে ঋষভের নিজের ফ্ল্যাট খুব একটা দূরে নয়। ঋষভের ইচ্ছে করছে ঐশীকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে যেতে। সোমা দেখুক। এবং দেখে জ্বলেপুড়ে যাক, তা হলেই হয়তো ঋষভের প্রতি তার তাচ্ছিল্য আর অনাগ্রহটা কমবে।

অবশ্য শুধু ভাবনার স্তরেই থাকল ইচ্ছেটা। শেষ পর্যন্ত ঐশীর কড়েয়া রোডের ফ্ল্যাট পর্যন্ত গিয়ে তাকে পৌঁছে দিল ঋষভ।

"স্যার, ওপরে আসুন না প্লিজ," গাড়ি থেকে নামতে-নামতে বলল ঐশী।

"ক'তলায় তোমাদের ফ্ল্যাট?"

"তিন তলায়। লিফ্ট আছে।"

"লিফ্ট থাকা না-থাকাটা কোনও ব্যাপার নয়। আমি জিমে যাই রোজ।"

তিন তলায় উঠে ওর ফ্ল্যাটে পৌঁছে ভাল লাগল ঋষভের। ছোটখাটো ছিমছাম দুটো বেডরুমের একটা ফ্ল্যাট। বেশ সাজানো গোছানো।

ঋষভের সঙ্গে আলাপ করতে গদগদ হয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন ঐশীর বাবা-মা। কৌতূহলী চোখে সামনে এসে বসল ওর ছোট ভাই দীপাঞ্জন।

কথাবার্তার ফাঁকে ফ্রিজ থেকে মিষ্টি আর বাড়ির তৈরি ঘুগনি এসে হাজির। সঙ্গে চা। ঋষভ আঁতকে উঠে বলল, "এইমাত্র খেয়েদেয়ে এসেছি তুমি জানো ঐশী। ফরমালিটিস না করলেই চলছিল না?"

ঐশীর বাবা-মা দু'জনেই অতবড় একজন লোকের সঙ্গে কী বিষয়ে কথাবার্তা বলতে হবে বুঝতে না পেরে একটু জড়সড় হয়ে বসে আছেন। ছোট ভাইটা একটু অপ্রতিভভাবে ঋষভের দু'-একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। নিজে থেকে কিছু বলেনি। ঋষভের সম্পর্কে ঐশীর কাছে তাঁরা অনেক কথাই শুনেছেন। ঐশীর মাইনে বেড়েছে ওঁর জন্য, প্রমোশনও হয়েছে ওঁর জন্য।

নীচে নেমে গাড়িতে ওঠার আগে স্মিত হেসে ঋষভ বলে, "আসি তা হলে?"

"হ্যাঁ স্যার। আপনি কিন্তু ডিপ্রেস্ড হয়ে থাকবেন না। ছোটমুখে বড় কথা শোনাচ্ছে হয়তো, কিন্তু আপনাকে এর আগে এরকম সত্যি কখনও দেখিনি। আপনার মতো পার্সোনালিটির লোক যদি এরকম হয়ে পড়েন...!"

ঋষভ মুখের মৃদু হাসিটা বজায় রেখেই বলল, "এখনও ডিপ্রেস্ড লাগছে কি আমাকে?"

"না, তা নয়।"

"তবে?"

"তবে...আপনি এখন কিন্তু ক্লাবে-টাবে যাবেন না। আপনি বরং বাড়ি

Be familiar with www.banglatorrents.com

যান। দেখবেন বাড়িতে অনেক শান্তি।"

"তুমি বেশ পাকা-পাকা কথা বলছ দেখছি। বাট হিয়ার আই অ্যাম নট ইয়োর বস। আই অ্যাম ইয়োর ফ্রেন্ড। অতএব বন্ধুর কথাই শিরোধার্য হোক।"

ঋষভের কথার ধরনে হেসে ফেলে ঐশী। আর গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে খানিকটা যেতেই ঋষভের মনে হয় নয়ডার প্রজেক্টটা বানচাল হয়ে প্রথমটায় সত্যিই যত কষ্ট হয়েছিল, এখন এই আসন্ন সন্ধ্যায় ঐশীর সঙ্গে খানিকটা সময় কাটানোর পর আর যেন ততটা কষ্ট হচ্ছে না।

অফিসের কাজে সারাটা দিনই প্রায় বাইরে কাটাতে হয় সায়ন্তনকে। প্রোডাক্ট ডেমোনস্ট্রেশন, নতুন কাস্টমার ধরা, পুরনোদের কাছে গিয়ে অভিযোগের কথা শোনা। তার উপর চেক কালেকশন করে নিয়ে আসা তো আছেই। ক্রেডিট কার্ডের পেমেন্টগুলো ঠিকমতো আসছে কি না, ব্যাঙ্কে মাঝে-মাঝে খোঁজ নেওয়া সহ ডিলার আর ডিস্ট্রিবিউটরদের সঙ্গে ফ্রি গিফ্‌ট, কমিশন ডিসকাউন্ট নিয়ে দর কষাকষিও লেগে থাকে রোজ।

সায়ন্তনদের মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের সকলেরই এরকম বেশ ব্যস্ত শিডিউল। এই ডিপার্টমেন্টের কাজের উপর নির্ভর করে আছে কোম্পানির অগ্রগতি। একটু পিছিয়ে পড়লেই ঋষভ মিত্র একসঙ্গে গোটা ডিপার্টমেন্টকে ডেকে পাঠাবেন। আলাদা আলাদা করে ঝাড় দেবেন সকলকে। আর সে ঝাড় খেলে চোখে জল এসে যায়, এমনভাবে অপমান করেন উনি।

তাই সায়ন্তনদের সকলকে বেশ তটস্থ হয়ে থাকতে হয়। আবার এজন্য তাদের সর্বদা যে-টেনশনটা থাকে সেটা মুখে প্রকাশ পেলেই হয়ে গেল কাজের দফারফা। প্রোডাক্ট মার্কেটিং করতে গেলে বডি ল্যাঙ্গোয়েজ কীরকম হওয়া চাই, কথাবার্তায় চাউনিতে কোন ভাবটা বজায় রাখতে হয় সেটা নিয়ে তাদের ট্রেনিংও চলে। কনফারেন্স রুমে প্রেজেন্টেশন দেখানো হয়। এই বিভাগে স্মার্ট সুপুরুষদেরই বাছাই করা হয়।

সায়ন্তন উত্তর কলকাতার এক প্রাচীন বনেদি বাড়ির ছেলে। একসময় গ্রুপ থিয়েটারে কিছুদিন অভিনয়ও করেছে। টিভি বা বড়পর্দায় অভিনয়ের জন্য মাঝে-মাঝে তার ডাকও আসে। কিন্তু সায়ন্তন ওসব অনিশ্চয়তার মধ্যে যেতে চায় না। এখানে সে ঋষভ সাহেবের নেকনজরে পড়ে গিয়েছে প্রথম থেকেই। তাই উচ্চাশাও ঘনীভূত হয়েছে। এখানে সে খুব শীঘ্রই অনেক উপরে উঠে যাবে।

পাঁচটা নাগাদ অফিসে ফিরে এসে একটা রিপোর্ট তৈরি করছিল সায়ন্তন। সারাদিন ঘোরাঘুরিতে দুপুরে আজ খাওয়া হয়নি। অফিস ক্যান্টিন থেকে চা আর দুটো ডিমের ডেভিল আনিয়ে নিয়েছে। অবেলায় এই ধরনের খাওয়া আজকাল তার অভ্যাস হয়ে গেছে। বাড়িতে মা শুনে খুব রাগারাগি করেন।

বলেন, "তোকে আর চাকরি করতে হবে না সায়ন। তুই বরং গ্রুপ থিয়েটারে ছিলি ভাল। এখানে কাজের যা চাপ তোর, শরীর খারাপ হয়ে যাবে। গ্যাসের প্রবলেমে ভুগবি।"

সায়ন্তন বলেছে, "মা, থিয়েটার করলে খাব কী?"

মা প্রণতিদেবী মুখ গোমড়া করে বলেছেন, "তাই বলে অসুখ বাধাতে হবে? ভগবানের দয়ায় আমাদের কি অভাব আছে? এত বড় বাড়ি, দালান কোঠা...।"

মাকে থামিয়ে দিয়ে সায়ন্তন বলেছে, "সবই তো ট্রাস্টের হাতে চলে গিয়েছে। দেবোত্তর সম্পত্তি একটা ছিল। আর ছিল ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আর শেয়ার। এখন সুদের টাকা ভাঙিয়ে খাওয়া হয়, আর লোক দেখানো দুর্গাপুজো। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি।"

ছেলের সঙ্গে তর্কে হেরে গিয়ে প্রণতি রণে ভঙ্গ দেন।

রিপোর্টটা শেষ হতেই সেটার একটা প্রিন্ট নিল সায়ন্তন। তারপর পড়ে দেখতে লাগল। হাতের কাজ শেষ করে যথাসময়ে উঠতে হবে। সাড়ে পাঁচটায় ছুটি। কিন্তু সাতটা সাড়ে সাতটার আগে কোনওদিন বেরনো হয় না। এখন এই সময়টা একটু কাজের চাপ কম থাকে।

তাই প্ল্যান আছে সময়মতো বেরিয়ে ঐশীকে নিয়ে কোনও শপিং মলে ঘুরতে যাওয়া। একটু টুকটাক খাওয়া। ঝলমলে দোকান-পাট দেখতে-দেখতে পাশাপাশি ঘুরে বেড়ানো। মনটা ভাল হয়ে যায় বেশ।

রিপোর্ট ফাইনাল করে বারোতলায় ইন্টারকমে কল করল ঐশীকে। ফোনটা বেজে গেল বেশ কিছুক্ষণ। কেউ ধরল না। ঐশী কি বসের ঘরে ঢুকেছে নাকি?

একটু পরে দ্বিতীয়বার ফোন করতে মোবাইলটা হাতে নিয়েছে সায়ন্তন, অনুভব করল তার কাঁধে কেউ হাত রেখেছে।

সায়ন্তন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পাশে দাঁড়ানো রাজাদা। রাজা দাশগুপ্ত। লোকটা একটা মিটমিটে ডান। এই ডিপার্টমেন্টের অনেকেই ওকে এড়িয়ে চলে। কারও ভাল দেখতে পারে না, কাজেরও তেমন একটা নয়। ঋষভ স্যার বার দুয়েক ওয়ার্নিং দিয়েছেন ওকে। অথচ বহু পুরনো লোক।

"পাখি উড়ে গিয়েছে হে সায়ন্তন।"

"মানে?"

"ঐশীকে খুঁজছ তো? সে আজ বসের সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরিয়ে গিয়েছে। দু'জনের কেউ আর আজ ফিরবে না।"

"আপনি কী করে জানলেন?"

"আরে, জানব কেন? স্বচক্ষে দেখলাম। লিফটে চড়ে নামল, তারপর পাশাপাশি গাড়িতে বসে হুশ করে বেরিয়ে গেল।"

"আপনি বুঝি ফলো করেছিলেন?"

"আহা, অত জেরা করার কী আছে? যা ঘটল তাই বলছি। সাহেবের যে ভারী মন খারাপ আজ।"

"কেন?"

"নয়ডার প্রজেক্টটা বানচাল হয়ে গিয়েছে যে! চেয়ারম্যানের অর্ডার..."

"আপনি এতসব জানলেন কী করে রাজাদা?"

প্রশ্নটা অবশ্য না করলেও চলত। এ অফিসে সকলেই জানে, ঋষভের বিপক্ষে যারা আছে, তাদের একজন হল কাশীনাথ সান্যাল। আর রাজা দাশগুপ্ত তারই ডানহাত।

রাজাদা কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই সায়ন্তন নিজে থেকে বলে উঠল, "মানলাম তাঁর মন খারাপ। তা বলে ঐশীকে নিয়ে বেরিয়ে যাবেন কেন? আগে তো কখনও এরকম হয়নি।"

"আরে বাবা, মন খারাপ হলে তা ভাল করার একমাত্র ওষুধ হল নারীসঙ্গ। তার উপর সে নারী যদি আবার সুন্দরী হয়।"

ঠাসঠাস করে কয়েকটা চড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছে করল রাজা সেনগুপ্তের গালে। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে সায়ন্তন উঠে গেল নিজের টেবিল ছেড়ে। তারপর করিডোরে এসে মোবাইলে ঐশীর নম্বরটা ডায়াল করেও শেষে কল করার আগেই নম্বরটা কেটে দিল সায়ন্তন। ভিতরে-ভিতরে কী যেন একটা হচ্ছে। সেটা রাগ না দুঃখ না অভিমান ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারছে না সে।

**মৃত নগরীর সিঁড়ি**

রোজ দুপুরবেলায় সামনের বাড়ির জিতুবাবুদের কার্নিশে গোটাকয়েক গোলা পায়রা এসে বসে। তাদের রং সাদা, খয়েরি আর বেগুনি। সারাদুপুর ধরে নাগাড়ে বকবকম শব্দ করে নির্জন দুপুরকে তারা আরও নির্জন করে তোলে। মাঝেমাঝে এক-একটা আবার আর-একটার পিঠে চড়ে বসে।

দশ বছরের বিভাস খিলখিল করে হেসে ওইদিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, "ও ছোটমাসি, ওই দ্যাখো ওদের কাণ্ড।"

ছোটমাসি শ্যামারানি চোখ পাকিয়ে বলে, "এই বাঁদর ছেলে, তোকে না দিদি অঙ্ক দিয়ে গেছে। আর তুই সেসব না করে ওদিকে চেয়ে কী দেখছিস?"

"আমার অঙ্ক করতে ভাল লাগছে না।"

"বললে হবে ও কথা? দিদি যে বলে গেল হোমটাস্ক না করে নিয়ে গেলে স্কুল থেকে চিঠি আসবে।"

"কিছু আসবে না মাসি। মা ওরকম ভয় দেখায়। তুমি এক কাজ করো বরং। তুমি এই বইটা থেকে একটা গল্প পড়ে শোনাও। আমি অঙ্কের খাতা নিয়ে বসে আছি, মা কড়া নাড়লেই তুমি গল্প থামিয়ে দেবে।"

"কী বই ওটা?"

"বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প।"

"দে তাহলে। আমারও পাহারাদারি করতে-করতে একঘেয়ে লাগছে। দিদি যে কতক্ষণে ফিরবে! তাছাড়া তুই বুঝবি না বিভু, এ বাড়িতে আমার আর একদণ্ডও মন টিকছে না। দেশে গিয়ে হারমোনিয়ামটা নিলে গলা সাধলেও মনটা ভাল লাগত।"

"মা পেনশন তুলতে গিয়েছে। ফিরতে দেরি হবে।"

ছোটমাসি গোপনে একটা শ্বাস ফেলে। দাদাবাবু যে কেন এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন! সরকারি চাকরি, তাই পেনশনটুকু আছে। তবে তাতে দিদির বাসাভাড়া দিয়ে সংসার চলবার কথা নয়। অবশ্য চেতলার গলির মধ্যে এই ছোট্ট একরত্তি বাসার ভাড়া তেমন নয়, তাই রক্ষে। বাড়িওলা ভাড়া বাড়ানোর চেষ্টা করলেও, আরও দু'জন ভাড়াটিয়াসহ দাদাবাবু বাড়িভাড়া বাড়াননি। তাই


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

মাসে-মাসে রেন্ট কন্ট্রোলে বাড়িভাড়া জমা হয়। প্রতিমাসে পঁচাত্তর টাকা।

বিভাসের মনে তেমন কোনও স্মৃতি নেই। শুধু বাবার আকস্মিক মৃত্যুটা ছাড়া। তবে এই ছোটমাসি তার দু'-একটি উপন্যাসে গল্পে নানাভাবে এসেছে। বসে-বসে পুরনো দিনের কথা ভাবছিল সে। চায়ের দোকানে কবি-সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও তেমন জমেনি, উল্টে মতান্তর হয়েছে। বিলাসপুর থেকে ফেরার পর তিন-চারটে দিন বাড়ি থেকে সে মোটেই বেরোয়নি। এবং একটি অক্ষরও লেখেনি। একটা ভারী পাথর যেন কেউ তার হৃৎপিণ্ডে ঝুলিয়ে দিয়েছে। অনেক ভেবেও সে দময়ন্তীর এই আচরণের কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না। কোনও স্বাভাবিক কারণ খুঁজে পাচ্ছে না।

অলকেন্দু এর মধ্যে বারদুয়েক ফোন করেছিল। ধরতেই হয়েছে। নইলে সে বাড়িতে চলে আসবে। সংক্ষেপে কিছু কথাবার্তা সেরে শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে ফোন রেখে দিয়েছে বিভাস।

বাড়িতে মা ও রুমকি এবং অবশ্যই রাই ওকে সর্বক্ষণ পেয়ে মনে-মনে খুব খুশি। উমারানি অবশ্য উৎকণ্ঠিত হয়ে বারবার শরীর-টরির খারাপ হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করেছেন।

রুমকি স্কুলের খাতা দেখতে-দেখতে বলে, "মা, এই স্যাঁতসেঁতে বাড়ি না ছাড়লে এক-এক করে আমাদের সকলেরই অসুখ ধরবে একদিন।"

কথাটা শুনে উমারানির বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে। সত্যিই তো, সে মানুষটাও এমনই তিন-চারদিনের জ্বরে চলে গেল। কী জানি বাবা, অদৃষ্টে কী আছে!

সেদিন মাঝরাতে রুমকি হঠাৎ পাশ ফিরে বিভাসকে গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে একটা প্রগাঢ় চুম্বন করে আদরের গলায় ফিসফিস করে বলল, "এই মানকু কী হয়েছে তোমার, আমায় বলবে না?"

বিভাস ওর হাতটা গলা থেকে সরিয়ে না দেওয়াতে রুমকি আরও একটু প্রশ্রয় পেয়ে হাতটা বিভাসের নিম্নাঙ্গে রেখে তাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করতে লাগল। বিভাস তবুও পাথর। তবে রুমকিকে প্রত্যাখ্যানও করছে না।

রুমকির চেহারায়, ব্যবহারে যে আজ আর কোনও আকর্ষণ নেই, তার কারণ তো বিভাস নিজেই। এই তিন দিন ধরে সে দময়ন্তী ও রুমকিকে দাঁড়িপাল্লার দু'দিকে রেখে তুলনামূলক অনেক চিন্তাভাবনা করেছে। কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি এখনও। দময়ন্তী না রুমকি? রুমকি না দময়ন্তী? সদুত্তর মেলেনি।

তবে এটা ঠিক, দময়ন্তী যখন তাকে একবার প্রত্যাখান করেছে এবং বেশ ঋজুতার সঙ্গে, তখন তার কাছে ফিরে যাওয়াটা হবে নিজেকেই ছোট করা। যদিও বিভাসের মনে হয় দময়ন্তীর জন্য, প্রেমের জন্য, ভালবাসার জন্য ছোট হওয়ার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই।

সেই সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল, দময়ন্তী সেদিন কতটা নির্মম হয়ে গিয়েছিল তার প্রতি। কতটা উদাসীন। বিভাসের কোনও প্রশ্নেরই জবাব সে দেয়নি। নিজের আচরণের কোনও ব্যাখ্যা বা কারণ দেখায়নি। এবং দময়ন্তী যে-ধরণের মেয়ে তাতে বিভাস ভাল করেই জানে যে, সে যতই প্রত্যাশা করুক, দময়ন্তী ভুল বুঝবেই এবং তাকে ফোন করবেই, আদতে কিন্তু সেটা ঘটবে না। এবং সত্যিই ঘটেওনি।

অতএব মনকে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া এখন আর কিছুই করার নেই। সে পাশ ফিরে গভীর বাহুবন্ধনে বেষ্টন করল তার বহুদিনের বঞ্চিতা অসুখী স্ত্রী, তার সঙ্গী রুমকিকে। এবং মনে-মনে বলল, "সুখী হও রুমকি, তৃপ্ত হও। মনের সব জ্বালা জুড়িয়ে যাক তোমার।"

মাঝরাতে কখন যেন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল ছোটমাসি। এসেই হইহই করে উঠল ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে, "আমার হারমোনিয়াম এনেছিস? হারমোনিয়াম? বিভাস, একটা ভারী নতুন রাগ শুনলাম আজ। তুলতে পারিনি অবশ্য। মিশ্র পাহাড়ী। কোমল নি আর শুদ্ধ রা একটু অদলবদল করে মিশ্র খাম্বাজকে..."

"কী আবোলতাবোল বকছ মাসি?"

"কেন রে, আমি গান বুঝি না বলতে চাস?"

"তা কেন? তুমি গাও ছোটমাসি। বেশ ছোটবেলার কথা মনে পড়ে শুনলে। জানো তোমাকে নিয়ে আমি কত গল্প লিখেছি? আর সে গল্প পড়ে কত লোকে যে ভাল বলেছে!"

"ও মা! সে কথা তো কই কখনও বলিসনি।"

"বলব কী, তুমি তো হুট করে কোথায় চলে গেলে। তোমাকে কোথাও খুঁজেই পেলাম না।"

"কী লিখেছিস গল্পে আমাকে নিয়ে?"

"লিখেছি তুমি কেমন সুন্দর গান গাইতে।"

"আর আমার যে বিয়ে হল না সে কথা লিখিসনি? লিখিসনি আমি অসুন্দর, কালো কুৎসিত?"

"মাসি, তোমার মতো অমন সুন্দর গানের গলা কারও আছে? তুমিই তো গাইতে 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।'"

"সে গান গেয়েছিলাম তো রে বিভু। কিন্তু তাতে কাজ হল কই?"

"তোমার তো তর সইল না। তুমি চলে গেলে সকলকে ছেড়ে..."

"যাব না? আমার যে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কে মানুষ করত আমার কোলের খোকাটাকে?"

"কে এই সর্বনাশ তোমার করেছিল ছোটমাসি, বলবে আমায়?"

"তার নাম বলা যাবে না রে বিভু..."

ঘুম ভেঙে গেল বিভাসের। ভোর হচ্ছে। জানালা দিয়ে সরলরেখায় ভেসে আসছে চিকন একফালি সূর্যের আলো। আর কয়েকদিন পরপরই মাঝে-মাঝে দু'-এক পশলা বৃষ্টি হতে থাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে স্নিগ্ধ বাতাসও। তবে এই বদ্ধ ঘরে এই আলোর অস্তিত্ব, এই স্নিগ্ধতা বড় ক্ষণস্থায়ী।

রুমকি উঠেছে। সে-ও তাকিয়ে দেখছে এই সকাল হওয়া। আজ ওর মুখটা ভারী প্রসন্ন—'কার জীবনে প্রভাত আজি ঘুচায় অন্ধকার?' স্বামীর ভালবাসায় হয়তো ওর মনের অন্ধকার ঘুচে গেছে আজ সকালে।

ছোটমাসিকে দেখা স্বপ্নটা এইরকম ঘুরেফিরে আসছে আজকাল। বিশেষত মনটা নানা দোটানায় চঞ্চল থাকে যখন।

এই বদ্ধ গলির ভিতর আলো-বাতাস তেমন ঢোকে না। কলতলা পিছল, বাথরুমের চৌবাচ্চায় ও দেওয়ালে ঘন সবুজ শ্যাওলা। কড়িকাঠের বিমগুলো লাল মরচে ধরা। আর দেওয়াল ভরা উই পোকার ঢিবি। এই বাড়িতে আসতে গেলে যে-সংকীর্ণ গলিপথ দিয়ে ঢুকতে হয়, সেখানে গাড়ি বা ট্যাক্সির জায়গা হয় না। বাড়ির দরজার একপাশে সর্বদা পড়ে থাকে স্তূপীকৃত আবর্জনা, উচ্ছিষ্ট, মরা ইঁদুর। কাক আর বেড়াল আবর্জনা ঘেঁটে ছড়ায়। সেসব প্রায় মাড়িয়েই ঢুকতে হয় রোজ।

এই বাড়ি ছাড়তে পারলে তো ভালই হতো। কিন্তু তাই বলে কলকাতা ছেড়ে সেই ভদ্রেশ্বরে! আর এত টাকা যে হঠাৎ ইনভেস্ট করবে, আসবে কোথা থেকে?

রুমকি লোন করবে। সে নিজেও তো টাকা চেয়েছে ঋষভের কাছে। কেননা প্রকাশকরা এক থোকে তার মতো লেখককে অত টাকা একসঙ্গে বের করে দেওয়ার পার্টি নয়, মুখে যত গদগদ ভাবই দেখাক না কেন। টাকার কথায় বিভাসের মনে পড়ল, ঋষভকে আজই একটা ফোন করা খুব দরকার। বলেছিল বাড়িতে আসতে। কিন্তু বাড়ি গেলেই তো ওর স্ত্রী সোমা আবার ছেঁকে ধরবে। টাকার দরকারের সময় সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে কচকচি করতে ভাল লাগবে না। তা সে যত পেশাদারি লেখকই হোক।

চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে এলো রুমকি। রাই এখনও ঘুমোচ্ছে। শরীর দুর্বল বলে এই সপ্তাহটাও বিশ্রাম নিয়ে সামনের সপ্তাহ থেকে স্কুলে যাবে। মা রান্নাঘরের পাশের ছোট্ট ঠাকুরঘরে বসে আহ্নিক করছে। মাঝে-মাঝে ভেসে আসছে ঘণ্টা নাড়ার আওয়াজ। একটু পরেই পেতলের রেকাবিতে কয়েকটা নকুলদানা নিয়ে গরদের শাড়ি পরে মা এ ঘরে ঢুকবে। রুমকি সকলের জলখাবারের ময়দা মাখছে। দেখেই বোঝা যায়, ওর মন আজ খুব খুশি।

এই প্রাত্যহিকতা, এই প্রসন্নতা, এই সকালের স্বল্পস্থায়ী একফালি রোদ আর এই সংসারের নানা সুখ-দুঃখে জড়িয়ে যাওয়ার যে-আনন্দ, যে-রোম্যান্টিকতা, তার দাম বিভাসের কাছে অসীম। কিন্তু বায়না করা পেশাদারি লেখা লিখতে-লিখতে প্রাণের যোগ যেন অনেক কমে যায়। সে লেখায় তাড়া থাকে, শব্দের সীমাবদ্ধতা থাকে, টাকার চাহিদা থাকে, চাপ থাকে। থাকে না শুধু স্বতঃস্ফূর্ততা কিংবা প্রাণমন ঢেলে দেওয়ার আনন্দ।

বিভাস বলতে চাইছে অফুরান ইচ্ছাশক্তি, প্রেম এবং অন্তহীন জীবনপ্রবাহের কথা, কিন্তু যে-বিষাদ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?

দুপুরে লেখার টেবিলে এসে বসল বিভাস। আগে যতটুকু লেখা হয়েছিল, সেটা মন দিয়ে পড়ে যেতে লাগল। পড়ছে আর সংশোধন করছে। মাঝেমাঝে এক-একটা পৃষ্ঠা নতুন করেও লিখতে হচ্ছে।

বিকেল চারটে নাগাদ একটা ফোন এল।

"বিভাসদা বলছেন?"

"হ্যাঁ?"

"আমার নাম অর্জুন রায়। আমি নিউজার্সিতে থাকি। ইন্ডিয়ায় এসেছি গতকাল। এবার অগস্ট মাসে ওখানে একটি সম্মেলনে আমরা আপনাকে চাই। আপনি অতনু সান্যালকে চেনেন নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ, আমার খুড়তুতো ভাই।"

"অতনুই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে। আপনার ফোন নম্বরটাও দিয়েছে।"

Stampy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

"তাই নাকি? অতনু এসেছে কলকাতায়?"

"না। ও কারেন্টলি একটু বিজি আছে। ওর স্ত্রী পম্পা তো আপনার গ্রেট ফ্যান। আমিও কিন্তু তাই।"

বিভাসের গর্বে বুক ফুলে উঠছে। সুদূর আমেরিকা থেকে ডাক। বিনা খরচে আমেরিকা ভ্রমণ!

"আপনি কনফার্ম করছেন তো বিভাসদা?"

"একটু ভেবে বলব। আপনি আছেন তো এখন কলকাতায়?"

"হ্যাঁ, দিন পনেরো তো বটেই। আমি সামনের সপ্তাহে ফোন করি আবার?"

"ঠিক আছে।"

"বাই, বিভাসদা।"

রাইকে নিয়ে পাশের ঘরে রুমকি একটু অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধহয়। বিভাসের ফোনে উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে উঠে এসে বলে, "কী হয়েছে গো? কার ফোন?"

"রুমকি, গ্রেট নিউজ। এবার আমেরিকা থেকে আমাকে ইনভাইট করেছে।"

"সত্যি?"

"নয়তো কী বানিয়ে বলছি?"

বিভাসের কণ্ঠস্বরে বাড়িতে একটা সাড়া পড়ে যায় যেন। উমারানি সব শুনে-টুনে রুমকি আর রাইকেও নিয়ে যেতে বলে আমেরিকায়। রুমকি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, মুখে গভীর প্রত্যাশা। বিভাস কী বলবে?

রাই দৌড়ে এসে বাবার কোলে বসে পড়ে বলে, "আমাদেরও নিয়ে চলো না বাবা। আমি আমেরিকা দেখিনি কখনও..."

ওর কথায় বিভাসের চোখে জল এসে যায়। আমেরিকা যেন বাঙালির স্বপ্ন। রঙিন দেশটি মানুষকে সবসময় হাতছানি দেয়। আর সেখানেই বিনা পয়সায় ঘুরে আসার সুযোগ!

কত হাজার কিলোমিটার দূরে বসে মানুষ তার লেখা বই পড়ছে। পড়ে মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখতে চাইছে। তার সান্নিধ্য পেতে চাইছে। কয়েকখানা ভাল জামাকাপড় এবার কিনে ফেলতেই হবে। নইলে মান থাকবে না ওখানে।

রুমকি বলে, "আমাদের নিয়ে তুমি যাবে না, সে আমি খুব ভাল করেই জানি। আয় রে রাই, আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখিস না। আমাদের এই নর্দমার গন্ধ শুঁকে-শুঁকেই সারাজীবন কাটিয়ে দিতে হবে। আমেরিকা! হুঁ!"

গলায় বিদ্রূপের সুর তুলে রাইকে নিয়ে চলে গেল রুমকি সেখান থেকে।

বিভাসের মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়। এ বাড়িতে কেউ বাহবা দিতে জানে না, তার গুণের কদর করতে জানে না। সব সময় ঠেস দিয়ে কথা।

গায়ে শার্ট চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল বিভাস। অলকেন্দুকে ফোনে এ খবরটা জানাতেই হবে। তবে লেখক-বন্ধুদের নিজে থেকে গায়ে পড়ে না বলাই ভাল। আদেখলা ভাববে। তাছাড়া সবাই ভাল মনে নিতেও পারবে না। সে শুভদীপই হোক, তরুণই হোক, আর অরুণাংশু বা স্বর্ণাভই হোক। তবে তার প্রকাশকরা খুশি হবে। তাদের লেখক জাতে উঠেছে বলে।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিক ঘটবে তো? ফোনে তার সঙ্গে হয়তো কেউ রসিকতা করছে। কিংবা যারা নিয়ে যাবে, তাদের প্ল্যান পাল্টে যেতেই বা কতক্ষণ! হয়তো বিভাসের চেয়েও ভাল দরের আর-কোনও সেলেব্রিটিকে ওরা হাত করে ফেলল। বলা তো যায় না। বিভাসের ভাগ্যে তখন লবডঙ্কা।

অলকেন্দু খুব খুশি হয় খবরটা শুনে। ওর মতো বন্ধু সত্যি হয় না।

"ব্রাদার, আমার অফিসে চলে আয়। ব্যাপারটা সেলিব্রেট করা যাক।"

"আগে যাওয়া হোক।"

"ও হয়েই গিয়েছে। ওরা অত কাঁচা নয় যে, না ভেবেচিন্তেই করে তোকে প্রস্তাবটা দিয়ে দেবে। ওদের সব আগে থেকেই শিডিউল করা থাকে।"

"তা বটে। আর মাঝখানে আমার ওই খুড়তুতো ভাইটা আছে না? তাই খানিকটা ভরসা করতে পারা যায়।"

"তবে চলে আয় গুরু..."

"আজ থাক রে। কাল ঠিক আসব। একটু কাজে বেরিয়েছি।"

"তোরা শালা লেখকরা রাম-কুঁড়ে। তোদের আবার কাজ কী রে?"

হাসতে-হাসতে ফোনটা ছেড়ে দিল বিভাস। সবচেয়ে যে বেশি খুশি হত এই খবরে, সে হল দময়ন্তী। এখনও হবে। নিশ্চয়ই হবে। ওকে একটা ফোন করা যাক বরং।

অস্বস্তি নিয়েই দময়ন্তীর নম্বরটা ডায়াল করল বিভাস। রিং হচ্ছে। বেজে যাচ্ছে ফোনটা। ফোনটা বেজে-বেজে একসময় থেমে গেল। পাঁচ সাত মিনিট অপেক্ষা করল বিভাস। যদি কল ব্যাক করে। না, তা-ও করছে না। আবার কল করে সে। ধরছে না দময়ন্তী। ধরছে না। ধরবেই না বোঝা যাচ্ছে।

এই পৃথিবীতে দময়ন্তী আছে, বিভাসও আছে। অথচ তাদের আর কোনও যোগাযোগ নেই। কে কী করছে, কী নিয়ে ব্যস্ত আছে, কখন গান শুনছে, কখন বা বই পড়ছে, তারা কেউ তার কোনও খবর রাখে না।

বিভাসের কান্না পায়, ভিজে ওঠে চোখ। বুক তার ভেসে যাক জলে। তবে যদি সে আসে! সেই রবিঠাকুরের গানের মতো, 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল/ বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।' তেমনটা যদি সত্যি হয়?

রুমকি আবার আগের মতো কঠিন একজন মানুষ হয়ে গেছে। তার এখন আর কোমলতা নেই, ভেঙে পড়া নেই, আকর্ষণ নেই, কাম নেই, কিছু নেই।

সে স্বামীকে তাগাদা দেয়, "আমেরিকা আমেরিকা করে যে খুব নাচছ, আমেরিকা কি তোমায় মাথায় করে রেখে দেবে! ফিরে তো সেই আবার আসতেই হবে এই অন্ধ পচা গলির নরককুণ্ডে!"

বিভাস উত্তর দেয় না। লেখক বিভাস হালদার সংসারের নানা চাহিদা আর দাবিদাওয়া মেটাতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছে।

রাই এসে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "আমেরিকায় ভাল-ভাল টেডি বেয়ার পাওয়া যায়, তাই না বাবা?"

"তা তো যাবেই। তোকে কে বলল?"

"আমাদের ক্লাসের দেবলীনা। ওর অনেকগুলো টেডি আছে।"

"তোমারও অনেকগুলো হবে। আমি এনে দেব মামণি। আমেরিকায় যাওয়ার তো অনেক দেরি আছে। এখন পড়তে বোস দেখি, সোনা।"

রুমকি বিরক্ত স্বরে বলে, "কেন মেয়েকে মিথ্যে স্তোক দিচ্ছ বলো তো? তুমি আনবে ওর জন্য জিনিস! তাহলেই হয়েছে! তার চেয়ে কাজের কথা শোনো। টাকাটা তাড়াতাড়ি যোগাড় করে ফেলো। ভদ্রেশ্বরের জমিটার খুব ডিমান্ড। এরপর দাম বাড়লে হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে তখন।"

বিভাসের মনে পড়ে যায়, ঋষভ বলেছিল ফোন করে ছুটির দিনে তার বাড়ি চলে আসতে। যদিও বাড়িতে যাওয়ার মোটেও ইচ্ছে নেই বিভাসের, তবু যখন একবার বলেইছে, টাকাটা হয়তো দেবে তাকে।

ঋষভকে অনেকটা চেষ্টা করেও মোবাইলে পাওয়া গেল না। দময়ন্তীর মতো এটাও খালি বেজে যাচ্ছে। ধরছে না। ওর অফিসের ল্যান্ডলাইনের নম্বরটা ওর কার্ডে লেখা আছে, কিন্তু সেটা এই মুহূর্তে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর দু'দিন পরেই রবিবার। আজ কথা বলে না রাখলে রবিবারে হুট করে চলে যাওয়া যায় নাকি বাড়িতে!

বিভাস দ্রুত পোশাক পরিবর্তন করে রওনা দিল ক্যামাক স্ট্রিটে ঋষভের অফিসের দিকে। লিফটে বারোতলায় পৌঁছে বিভাস ইতস্তত করছিল। করিডোর দিয়ে এগোলেই বাঁ দিকের শেষ ঘরটা। প্রথমে সেক্রেটারি মারফত এত্তেলা পাঠাতে হবে। তারপর ডাক আসবে। দরজা ঠেলতেই দেখা হয়ে গেল ঋষভের সেই সুন্দরী সেক্রেটারির সঙ্গে।

বিভাস কিছু বলার আগেই মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ভিতরে আসুন। স্যার অফিসেই আছেন। উনি কি জানেন আপনি আজ আসবেন?"

বিভাস গলা পরিষ্কার করে বলে, "না, জানে না। ওর মোবাইলে কিছুতেই পাচ্ছিলাম না, তাই..."

"ল্যান্ডলাইনে করলে আমি ভিতরে লাইন দিয়ে দিতাম। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না। চা খাবেন তো?"

বিভাস বুঝতে পারে, মেয়েটি তাকে লেখক হিসেবে চিনেছে এবং তাই অন্তরঙ্গতা করতে চাইছে। সে বিশেষ পাত্তা দিল না অবশ্য।

মেয়েটি ঋষভের ঘরে ঢুকল, এবং মিনিট তিনেক পরে বেরিয়ে এসে বলল, "দশ মিনিট পরে যেতে বললেন। স্যার একটু ব্যস্ত।"

ঋষভের ঘরে ডাক আসতেই বিভাস তড়িঘড়ি উঠে পড়ল তার কাঁধের ঝোলাব্যাগটা নিয়ে।

ল্যাপটপ থেকে চোখ না তুলে ঋষভ বলে, "ইয়েস বিভাস। আই ডিডন্ট এক্সপেক্ট ইউ হিয়ার। কী মনে করে? বলেছিলাম তো রবিবার ফোন করে বাড়িতে আসতে।"

বিভাস একটু থতমত খেয়ে যায়। এরকম ব্যবহার করছে কেন ঋষভ? ও কি খুবই ব্যস্ত কাজ নিয়ে?

"সরি, আমি তাহলে না হয় চলি। তোমায় ফোনে অনেক চেষ্টা করেও পাচ্ছিলাম না, তাই ভাবলাম..."

"ব্যস ব্যস, অনেক হয়েছে। টেক ইওর সিট বিভাস।"

বিভাস নিঃশব্দে বসে। ঋষভকে আজ ক্লান্ত দেখাচ্ছে, খানিকটা বিমর্ষ। ওর অফিসে কোনও প্রবলেম হয়েছে নাকি?

ল্যাপটপ ছেড়ে এবার উঠে পড়ে ঋষভ, "কত চাই?"

"ইয়ে, থার্টি থাউজ্যান্ড মতো হলে ভাল হত।"

"আর একটু বেশি নেবে?"

বিভাস অবাক হয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ঋষভের মুখের দিকে তাকায়। কী বলতে চাইছে ঋষভ?


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

ঋষভ একটা চাবি দিয়ে ওর পিছনের দেওয়ালের সারি-সারি সুদৃশ্য ক্যাবিনেটের একটা পাল্লা খুলে ফেলে। তারপর হাত গলিয়ে বের করে আনে বেশ কিছু হাজার আর পাঁচশো টাকার নোটের বান্ডিল।

বিভাসের হাতে তারই মধ্য থেকে একটা মোটাসোটা বান্ডিল তুলে দিয়ে ঋষভ বলে, "গুনতে হবে না বিভাস। যা চেয়েছিলে তার চেয়ে অনেক বেশিই আছে। আর, আর এসব টাকা কোনও হিসেবের মধ্যেও পড়ে না। এগুলো লাগে ঘুষ দিতে। ইনকাম ট্যাক্স, এক্সাইজ, কাস্টম্‌স সকলকে দিতে হয়। তুমি তো তাদের কাছে চুনোপুঁটি বিভাস। আর কালো টাকা সাদা করার জন্য এসব আমাকে করতেই হয়। অতএব..."

টাকাটা নেবে কি নেবে না ভাবতে যতটুকু সময় লাগে, তার চেয়ে অনেক কম সময়ে প্রায় স্বয়ংক্রিয় হাতে বান্ডিলটা ঝোলার মধ্যে রেখে দেয় বিভাস।

দময়ন্তী মস্ত একটা ঘা দিয়েছে বুকে। মনের মানুষ ঘা দিলে জীবন অর্থহীন হয়ে যায়। নিজেকেই বারবার আঘাত করতে ইচ্ছে করে। মনে হয় কার জন্য আর ভালভাবে বেঁচে থাকা! তাছাড়া তার দোষ কী! এ টাকাটা ঋষভ তাকে দিয়েছে। সে টাকার রং কালো না সাদা তা জেনে তার কী হবে? এতগুলো টাকা। হাজার পঞ্চাশ তো হবেই মনে হয়।

ফেরার সময় একটা ট্যাক্সি ধরল বিভাস। এই এতগুলো টাকা ভদ্রেশ্বরের জমি কিনে নষ্ট করবে? নাঃ, অন্য কোনও ভাল জায়গা খুঁজতে হবে। আর তারও আগে রুমকি, রাই আর মা'র জন্য ভাল দোকান থেকে শাড়ি, খেলনা কিনে নিয়ে যাবে বিভাস।

তবে এখন সবার আগে মেট্রোর পাশের গলিতে যে-পুরনো মদের দোকানটা আছে, যেটা সর্বদা সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, সেখানে বসে আকণ্ঠ মদ্যপান করবে বিভাস। আজ সে একা-একাই বসবে। একা-একাই খাবে। অলকেন্দুটাকেও ডাকবে না। দময়ন্তী তাকে চোট মেরেছে। মারুক। যত খুশি মারুক। জীবনটা কীভাবে উপভোগ করতে হয়, এইবার সেটা দেখিয়ে দেবে বিভাস। এইবার সেটা দেখিয়ে দেবে।

**একা এবং কয়েকজন**

ঐশী বেশ বুঝতে পারছে, সায়ন্তন তার উপর কতখানি রেগে গিয়েছে। কিন্তু সে কী করবে? স্যারের পাশে বসে ওর সঙ্গে মোবাইলে কথা বলা যায় নাকি? তাই সে কাল সায়ন্তনের কলটা রিসিভ করেনি। ভেবেছিল রাতের দিকে ওকে ফোন করে সব বুঝিয়ে বলবে। কিন্তু সে সুযোগটাই দিল না সায়ন্তন। ফোন বন্ধ করে রেখে দিয়েছে।

আজ অফিসেও ওকে পাওয়া গেল না। নিশ্চয়ই আউটডোরে বেরিয়েছে। বিকেলের দিকে ফিরুক। তখন যে করে হোক ওর মান ভাঙাবে ঐশী।

ঋষভ ঐশীকে ডাকে। তড়িঘড়ি ঘরে ঢুকতেই ঋষভ তার রিভলভিং চেয়ারখানা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "প্রায় ছ'টা বাজে। বাড়ি যাবে না ঐশী?"

"যাব স্যার। আপনি এখনও রয়েছেন। তাই ভাবলাম..."

"কেন, আমি কি তোমায় আটকে রেখেছি? তুমি অবশ্যই এখনই বাড়ি যাবে এবং বাড়ি গিয়ে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নেবে। আমি ঠিক আটটার সময় তোমাকে পিক-আপ করে নেব তোমার বাড়ির সামনে থেকেই। তৈরি থেকো।"

"কোথায় যেতে হবে স্যার?"

"আজ তোমাকে একটু ট্রিট করব। অবশ্যই তোমার চয়েস মতো। কোথায় যেতে চাও তুমি? কোন রেস্তোরাঁয়?"

"কিন্তু আজ তো স্যার আমি প্রি-অকুপায়েড।"

"প্রি-অকুপায়েড!"

"আমার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর জন্মদিন। যেতেই হবে।"

ঋষভ একটু হতাশ মুখ করে তাকায় ঐশীর দিকে। হঠাৎ বড় কষ্ট হল, বড় মায়া হল ঐশীর। সে জানে এই মানুষটি কীভাবে প্রাণপাত করে এই কোম্পানিটাকে এত বড় করে তুলেছেন। অফিসই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। কত উন্নতি হয়েছে এই কোম্পানির তাঁর একার বুদ্ধি এবং জেদে। অথচ সেই মানুষটিই যেন ভেঙে পড়েছেন। চোখ মুখের সেই ব্যক্তিত্ব, সেই নিপুণ নির্দেশকের মতো কণ্ঠস্বর কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে হঠাৎ। মানুষটা যে আর ঠিক সেই আগের মানুষ নেই, এটা বুঝতে ঐশীর মোটেও ভুল হচ্ছে না।

সায়ন্তন রাগ করুক আর যা-ই করুক, ওঁকে আঘাত দিতে একটুও ইচ্ছে করে না ঐশীর। তিনি একজন কাছের মানুষের সঙ্গ চাইছেন। চাইছেন খুলে বলতে তাঁর মনের কথা। কেন ঐশী তাকে প্রত্যাখ্যান করবে, আঘাত দেবে!

সে বলল, "স্যার আমি তৈরি থাকব। বান্ধবীকে জন্মদিনের গিফ্‌ট কাল গিয়েও দিয়ে আসা যায়।"

উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ঋষভ, "রিয়্যালি? ওয়াও..."

অফিস থেকে বেরিয়ে ময়দান মেট্রো স্টেশনের দিকে দ্রুত হাঁটতে-হাঁটতে সায়ন্তনকে আর-একবার ফোন করল ঐশী। এবং আশ্চর্য, এবার কলটা রিসিভ করল সায়ন্তন।

"তুমি কি এখনও অফিসে?" সায়ন্তন গতকালের কথাটা তুললই না।

"বাড়ি যাচ্ছিলাম। তুমি কোথায়?"

"আমি এজরা স্ট্রীটে, একটা ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসে বসে আছি।"

"কত দেরি হবে?"

"আরও আধঘণ্টার মতো।"

"অফিসে ফিরবে?"

"ফিরতাম না। বাট বস ডেকেছে। একবার তো যেতেই হবে। সন্ধে হলেই আবার আমার বসের যত কাজ বাড়ে, ঠিক তোমার বসের মতো।"

"আমার বস আমাকে আগেভাগে ছুটি দিয়ে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, কী হয়েছে বিগ বসের ঐশী? সেনসেক্স ডাউন নাকি?"

"ওভাবে বোলো না প্লিজ। স্যারকে দেখলে কী ভীষণ খারাপ লাগে!"

"তাই বুঝি ওকে সঙ্গ দিচ্ছ। যদি মন ভাল হয়ে যায়?"

"কে বলল, সঙ্গ দিচ্ছি?"

"তবে?"

"দেখা হলে সব বলব। তবে আজ নয়। আজ আমার বান্ধবীর জন্মদিন। সেখানে যেতেই হবে। কাল বিকেলে অফিস ছুটির পর দেখা করো, সব বলব।"

"কাল তাহলে দেখা হচ্ছেই?"

"হ্যাঁ।"

"তোমাকে ট্রাস্ট করতে পারি তো?"

"না করার কী আছে?"

"আছে। তুমি হলে মূর্তিমতী সিস্টার নিবেদিতা। আর্তজনের সেবা করাই তোমার পরম ধর্ম। জাগতিক প্রেম-ট্রেম সব তার কাছে তুচ্ছ।"

ঐশী হাসতে-হাসতে ফোনটা রেখে দিল ব্যাগে। পা চালালো মেট্রো স্টেশনের দিকে।

ঐশীকে নিয়ে ঋষভ এসেছে গুরুসদয় দত্ত রোডের একটি রেস্তোরাঁয়।

এখানে বুফে আইটেমের সংখ্যা বড় কম নয়। ঐশী তার মধ্যে মাত্র কয়েকটা পদ তুলে নিয়েছে প্লেটে। ঋষভও তাই।

খাওয়ার আগে ঋষভ জিজ্ঞেস করল, "বিপিনবাবুর কারণসুধা একটু চলবে নাকি?"

ঐশী প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গিয়ে পরে হেসে বলল, "না স্যার, আমি তো ওসব খাই না।"

"তবে আমি একটু নিই?"

"হ্যাঁ স্যার, মাই প্লেজার।"

ঐশী একটা অ্যাপ্‌ল জুস নিল। আর ঋষভ নিল একটা ব্লাডি মেরি।

লাল টমেটোর রসে সিক্ত ভডকায় চুমুক দিয়ে ঋষভ আচমকাই বলে, "আমাকে নিয়ে যে একটা কন্সপিরেসি চলছে, এটা আমি ভাল করে বোঝার আগেই ওরা আমাকে নক আউট করে দিল। এমনকী চেয়ারম্যান সাহেবও আমাকে প্রোটেকশন দিতে পারলেন না।"

"স্যার, এখন থাক না ওসব।"

"ঠিক বলেছ ঐশী। থাক। আমি জানি, যে-মানুষ সংগ্রাম করে, সে পরাজিত হলেও মন খারাপ করে না।"

"সেকথা জানেন যখন, তখন মিথ্যে কেন কষ্ট পাচ্ছেন?"

"কষ্ট পাচ্ছি?"

"নয়তো কী? আপনার খাবার তো সব প্লেটে পড়ে আছে। আমার সঙ্গে ভাল করে গল্প-গুজব করছেন না। শুধুই হা-হুতাশ করে যাচ্ছেন। মন থেকে সব একেবারে ঝেড়ে ফেলুন। দেখুন কেমন চাঙ্গা হয়ে যাবেন।"

"আমায় কাউন্সেলিং করছ বুঝি?"

"ধরুন তাই। কিংবা বলতে পারেন বন্ধু হিসেবে পাশে দাঁড়াতে চাইছি।"

"ঐশী আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইয়োর জেসচারস। ইউ আর মাই রিয়েল ফ্রেন্ড। আমি তোমাকে পাশে চাই।"

"কিন্তু এটা তো স্যার সকলে ভাল চোখে দেখবে না।"

"না দেখুক। আই ডোন্ট কেয়ার।"

Be familiar with www.banglatorrents.com

এরপর আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট ধরে অনর্গল কত কী বলে গেল ঋষভ, যার সবটা শুনতে ইচ্ছে না করলেও, স্যারের সামনে বসে থাকতে অবশ্য ভালই লাগছিল ঐশীর।

ঋষভ উঠে গিয়ে আর একবার প্লেটে খাবার নিয়ে এল। দেখাদেখি ঐশীও। ঋষভ দু'-একবার অনুরোধ করায় একটা হার্ড ড্রিংকও নিয়েছে ঐশী। এই অভিজ্ঞতা বাড়ি গিয়ে ছোট ভাইটার সঙ্গে শেয়ার করা যাবে। কিন্তু সায়ন্তনের সঙ্গে? আদৌ নয়। ঋষভ স্যার তাকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় বসে ড্রিঙ্ক করছেন, এই ঘটনা জানতে পারলে বিয়ের আগেই সায়ন্তন তাকে ডিভোর্স করে দেবে। যা রাগ আর অভিমান ওর!

ফেরার পথে গাড়িতে উঠে ঋষভ ঐশীর গা ঘেঁষে বসল। তারপর ওর একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিল। ঐশী কোনও বাধা দিল না।

ঋষভ বলল, "তখন যেটা বলতে চাইছিলাম, অথচ তুমি বাধা দিলে বলে বলতে পারলাম না সেটা হল এই যে, আমিও নেপোলিয়নের মতো তিনটে খবরের কাগজকে এক লক্ষ বেয়নেটের চেয়ে বেশি ভয় পাই। মিডিয়া যদি আমার এই অবস্থার কথা একবার টের পায়, তবে সেটা নিয়ে খুব ফলাও করে লিখে দেবে। আর তাতে আমাদের কোম্পানির দুর্নাম হবে। বাজারে শেয়ার মার্কেটে এর একটা বড় রকমের প্রভাবও পড়তে পারে। ব্যাপারটা থেকে যে আমাকে উঠে আসতেই হবে ঐশী, সে যে করেই হোক।"

"আপনি পারবেন স্যার, আপনার প্রোফাইল আমরা সকলে জানি। আপনি আবার ঘুরে দাঁড়াবেন।"

ঋষভ একথার কোনও উত্তর দিল না। জানালার কাচের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল চুপ করে। ঐশীর হাতটা এখনও ঋষভের মুঠোয় ধরা।

সোমা বেডরুমের বড় ল্যাম্পস্ট্যান্ডের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে বিছানার একধারে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে আছে। চোখের সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একের পর এক দৃশ্য।

যেদিন নববধূ বেশে এ বাড়িতে ঢুকেছিল সোমা, সেদিন তার কত উৎকণ্ঠা, কত ভয়! অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবার থেকে সে এসেছে এক অভিজাত সম্ভ্রান্ত পরিবারে। সে কি পারবে এখানে মানিয়ে নিতে? নাকি এরাই পারবেন তাকে গ্রহণ করতে? কত ভয়, কত উৎকণ্ঠা!

তার মনে পড়ে যাচ্ছিল বিয়ের প্রতিটি খুঁটিনাটি উপাচারের কথা। পিছল ল্যাটা মাছ ধরা, দুধ উথলে ওঠা দেখা, ঋষভের সঙ্গে কড়ি খেলা...। দু' একদিনের মধ্যে বাড়ি খালি হয়ে গেল। সকলেই চলে গেলেন। বাড়িতে শুধু শ্বশুর, শাশুড়ি, তিথি, ঋষভ আর ওদের এক মামাতো ভাই সঞ্জয়।

বেশ মনে পড়ে, ফুলশয্যার দিন সকালে একটা মস্ত বড় মাছের মুড়ো খাওয়ার জন্যে যখন সকলে খুব পীড়াপীড়ি করছে, তখন সোমার হয়ে অনুভাই কথা বলেছিলেন, কাছে টেনে নিয়েছিলেন আন্তরিকভাবে।

প্রায়ই তিনি সোমাকে জিজ্ঞেস করতেন, "এখানে তোমার ভাল লাগছে তো? কোনও অসুবিধে হলেই কিন্তু বলবে। আমাকে তোমার শাশুড়ি না ভেবে নিজের মায়ের মতো, বন্ধুর মতো ভেবো। দেখো তাহলে মনে কোনও খেদ থাকবে না।"

কিছুদিন পর নিজেই সোমাকে নিয়ে গিয়ে একটা এনজিওর সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। এরা গ্রামে-গ্রামে চিকিৎসা আর শিশুশিক্ষার উপর অনেক কাজ করে। সোমার বেশ ভাল লেগে গিয়েছিল কাজটা।

সে মাটি থেকে উঠে এসেছে। সুতরাং মাটির মানুষদের সঙ্গে কাজ করতে, তাদের কাছাকাছি থাকতে, তাদের সুখ দুঃখ সমস্যার কথা শুনতে এবং তার প্রতিকারের কথা ভাবতে তার ভারী ভাল লাগত। ঋষভ যে আবার এসব মোটেও পছন্দ করত না সেটা বুঝতে পেরে গিয়েছিল সোমা। কেননা তাকে ডেকে ঋষভ মাঝে-মাঝে ঠেস দিয়ে কথা শোনাত। বলত, মালদা বাঁকুড়া মেদিনীপুরের চাষাভুসো লোকদের নিয়ে মেতে না থেকে একটু আদবকায়দা শিখতে। কোন হাতে ছুরিকাঁটা ধরতে হয়, কীভাবে প্লেটে খাবার তুলে নিতে হয়, প্রথম কারও সঙ্গে মিট করলে কীভাবে উইশ করতে হয়, কিছুই তো জানো না তুমি!

তখন থেকেই ঋষভ অফিস নিয়ে মত্ত হয়ে থাকত। সে বেশ কাজের ছেলে। তার ব্যক্তিত্ব আছে, সিনসিয়রিটি আছে। সে যে এতদূর উঠে আসবে সোমা তখনই সেটা বুঝতে পেরেছিল। তাই চেষ্টা করেছে তার যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে উঠতে। আদবকায়দা, শিষ্টাচার, স্বামীর রাতদিন টুরে যাওয়া, রাত করে বাড়ি ফেরা, কম্পিউটর নিয়ে পড়ে থাকা, সংসারের কোনও কাজে উৎসাহ না দেখানো...সব সে পরে মেনে নিয়েছে, শিখে নিয়েছে।

এনজিওর কাজে ডুবে থেকে সে তার মনের অনেক শূন্যতা, অনেকটা একাকিত্ব বোধ কাটাতে পেরেছিল। তারপর জিৎ এল একদিন কোলে, সংসার যেন আলোয় ভরে গেল। দামি-দামি খেলনা আর জামাকাপড়, আধো-আধো মুখের বুলি আর হাসির মধ্য দিয়ে বড় হয়ে উঠতে লাগল জিৎ।

প্রায় সেই সময়েই তারা শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আলাদা ফ্ল্যাটে উঠে এসেছে। সোমা এত বৈভব আর তারই সঙ্গে এতখানি একাকিত্ব আগে কখনও ভোগ করেনি। এরপর একদিন জিৎ চলে গেল কোডাইকানালের একটা বোর্ডিং স্কুলে। তারপর সেখান থেকে আমেরিকা। ঋষভ অফিস, টুর, ক্লাব, হোটেল আর পার্টি নিয়ে থাকে। একা সোমাও আস্তে-আস্তে বিউটি পার্লার, কিটি পার্টি, ফিল্ম ম্যাগাজিন এইসবের মধ্যে ডুবিয়ে দেয় নিজেকে। তবে ভাল বই পেলে পড়ার অভ্যাসটা ছাড়েনি।

মাঝে মাঝে হিন্দুস্তান রোডের বাড়িতে এসে সারাটা দিন কাটিয়ে যায় সোমা। কী যে ভাল লাগে তার! বাপের বাড়িতে বাবা খুব অসুস্থ। মা চলে গিয়েছেন তার বিয়ের বছর দুয়েক আগে। দাদা বউদির সংসারে গেলে তারা বড় বেশি হাত পেতে জিনিস চায়, ফলে সোমাকে বেশ বিব্রতই হতে হয়।

এই বাড়িতে গেলে শাশুড়ি-মায়ের সান্নিধ্য তো ভাল লাগতই, বাবাও ছিলেন বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অথচ সহৃদয়। পুরনো মূল্যবোধগুলো যারা জলাঞ্জলি দেয় না, তারা মানুষ হিসেবে সৎ ও আকর্ষক মনে হয় সোমার কাছে। আলিপুরের ফ্ল্যাট যেন কৃত্রিমতার একটা অসহ্য বলয়।

শ্বশুরমশাই ব্যস্ত থাকতেন তাঁর মক্কেল ও কোর্টের কাজ নিয়ে। এক-একদিন গভীর রাত পর্যন্ত আইনের বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতেন একতলায় তাঁর চেম্বারে বসে। সোমার হাত দিয়ে নীচে কফি অথবা চা পাঠিয়ে দিতেন অনুভা। বাপের এই কর্মনিষ্ঠাটুকু ছেলে ঋষভ পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর কর্তব্যবোধ, সামাজিকতা, সংসারের প্রতি দায়বদ্ধতা এসবের সিকি ভাগও তার মধ্যে বর্তায়নি।

সোমা এ বাড়িতে এলেই খুব খুশি হয়ে উঠতেন শ্বশুর-শাশুড়ি দু'জনে। সারাটা দিন গল্পে গুজবে আন্তরিকতায় বেশ কেটে যেত। সোমার মনে হত, এর চেয়ে পৃথিবীটা আর বেশি সুন্দর হতে পারে না।

ফ্ল্যাটের সামনে লিফ্‌ট থামার শব্দ হল। আর তারপরই ডোরবেলের মৃদু টুংটাং।

ঋষভ ফিরেছে। সোমা উঠে বাইরের ঘরে যাওয়ার জন্য উদ্যত, তার আগেই বেশ হনহনিয়ে ঋষভ এসে ঢুকল একেবারে বেডরুমে।

"এ কী, জুতো ছেড়ে আসোনি?"

ঋষভ উত্তর না দিয়ে খাটের এককোণে বসে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল। সোমা আর ঘাঁটাল না।

ঋষভ বলল, "আমি আজ আর ডিনার করব না। তুমি খেয়ে নিয়ো।"

"এটা আগে থেকেই খবর দিলে পারতে। গুরুদাসদের আগেই ছুটি দিতাম তা হলে। মোবাইল বন্ধ রেখেছিলে কেন?"

"ফোন করেছিলে বুঝি? এ সময়ে তুমি তো জেনারেলি ফোন কর না।"

"দরকার থাকতে পারে না? মা'র অসুখ যাচ্ছে। কখন কী প্রয়োজন..."

"কেন মা'র কী হঠাৎ কোনও বাড়াবাড়ি হল?"

"না, মা ভাল আছেন। তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও। তারপর বলছি।"

"আঃ, সোমা আজকাল তুমি এত সাসপেন্স দিয়ে কথা বলো কেন বলো তো? সারাদিন কী কাজের টেনশন, তোমাকে বললেও শুনবে না, বুঝতেও চাইবে না। কিছু খবর আছে? এনিথিং..."

"জিৎ আসছে এখানে, ফোর্থ মে। আর ঠিক দশ দিন বাদে।"

"সত্যি! দ্যাট্‌স আ রিয়্যালি আ গুড নিউজ। ইন ফ্যাক্ট, গত পনেরো দিনের মধ্যে এ খবরটা যেন আমার কাছে ওয়েসিসের মতো লাগছে।"

"ছেলেটা এলে একটু সময়-টময় দিয়ো। পারলে কয়েকদিন ছুটি নিয়ো।"

অন্য সময় হলে ঋষভ সোমার এই কথায় চটে যেত। হয়তো বা তর্ক করত। কিন্তু আজ তার মনে হল ছুটি নিলে সত্যিই যেন ভাল হয়। মন তার সত্যি একটু ছুটি চাইছে। মাঝে-মাঝে মাথা দপদপ করে। প্রেশারটাও এ সময় একবার চেকআপ করিয়ে নিলে বোধহয় ভাল হয়।

"জিৎ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল।"

"এখন ক'টা বাজে? হ্যাঁ, এই সময় করা যায়। ওখানে লাঞ্চের সময়।"

ঋষভ উঠে তখনই ফোন করে।

"হাই জিৎ।"

"ড্যাডি, হাউ আর ইউ?"

"ফাইন। তুমি? পড়াশোনা ঠিকঠাক চলছে তো?"

"ইয়েস, ড্যাড। আমি ইন্ডিয়ায় ফোর্থ মে আসছি, শুনেছ তো?"

"হ্যাঁ, শুনলাম। আ গ্রেট নিউজ ফর আস। খুব সাবধানে আসবে। পাসপোর্ট, টিকিট, ভিসা, ফরেন কারেন্সি সব ঠিকঠাক নিজের কাছে রাখবে। জার্নির জন্য একটা চেকলিস্ট তৈরি করে নিয়ো। আমি তোমাকে এ ব্যাপারে


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

একটা ই-মেল পাঠিয়ে দেব বরং...”

“ড্যাড, একটা রিকোয়েস্ট। শুনলাম তুমি নাকি মাকে মোটেও সময় দাও না। এটা কিন্তু ঠিক নয়।”

ঋষভ আড়চোখে সোমার দিকে তাকিয়ে বলল, “এটা তোমার মায়ের কমপ্লেন নিশ্চয়ই?”

‘মম হ্যাজ্‌ন’ট অ্যালেজড ইউ। বাট ইট্‌স আ ফ্যাক্ট। আমি যখন নেটে বসে মা’র সঙ্গে চ্যাট করি, তখন ওয়েব ক্যামে তুমি একবারও আসো না। মম কি মিথ্যে-মিথ্যে বলেছে! আমিও তো কতদিন তোমায় দেখিনি কথা বলার সময়।”

“জিৎ, মাই সন, শোনো...”

“আমাকে বলতে দাও ড্যাড। আমি কত দেখতে চাই তোমাকে, তোমাকে যখনই চাই মম বলে তুমি অফিসে। রাত ন’টা পর্যন্ত এত কীসের কাজ তোমার ড্যাড? অলসো, ইউ শুড টেক কেয়ার অফ ইওর হেল্‌থ।”

ঋষভ বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। ছেলের চোখা-চোখা কথার সে কোনও যুক্তিসঙ্গত জবাব খুঁজে পাচ্ছে না।

জিৎ বলে চলে, “আমাদের তো কোনও অভাব নেই ড্যাড। ইউ আর্ন আ লট। তোমার টাকাপয়সাও নিশ্চয়ই জমছে। তার উপর এখনও তোমার রিটায়ারমেন্ট এজ আসতে অনেক দেরি। তাই না?”

ঋষভ গোটা ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্য বলল, “ওয়েল ওয়েল। তোমার সব কথা আমি শুনব এবার থেকে। তুমি বেশ ম্যাচিওর হয়ে গিয়েছ দেখছি। আই অ্যাপ্রিশিয়েট দিস।...তুমি লাঞ্চ করেছ?”

“লাঞ্চে বেরোচ্ছিলাম।”

“দেন আই ওন্ট টেক মাচ অফ ইয়োর টাইম। হ্যাভ আ নাইস ডে।”

“থ্যাঙ্কস ড্যাড। রাখছি এখন। বাই।”

ফোন রেখে দেওয়ার পর ঋষভের মন যতটা ভাল হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, ঠিক ততটা হচ্ছে না। কারণ সোমা এখন ছেলেকেও তার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে। বস্তুত, বিয়ের পর থেকেই তার মনে হয়েছিল, এই মেয়েটি তার সঙ্গে কোনওদিন মানাতে পারবে না। অলিভিয়া বলে মেয়েটা তার সঙ্গে বিশ্বস্ত থাকলে তাদের বিয়েটা হত সত্যি সুখের। ওই ধাক্কাটা সামলে নেওয়ার জন্য তখন তার পক্ষে বাবা-মায়ের পছন্দ করা মেয়ের পাণিগ্রহণ করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। তাছাড়া যা রাশভারী মানুষ সুকুমার মিত্র। বিশেষ করে প্রায় বিশ বছর আগে তাঁর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করাটা সাতাশ-আঠাশ বছরের ঋষভের পক্ষে বেশ কঠিনই ছিল। আর সে সময় ঋষভ এটাও বুঝতে পেরেছিল যে, একদিকে বোধহয় ভালই হয়েছে। বিদেশিনী অলিভিয়াকে বিয়ে করে লন্ডন থেকে ফিরে বাবার সামনে দাঁড়ানোটা আরও অনেক কঠিন ও জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।

তবু জিতের সঙ্গে কথা বলে মনটা অবশ্য একটু হালকা লাগছে এখন। এই রেশটা বজায় রাখার জন্য সে লঘু স্বরে বলে, “তোমার ছেলে বেশ বড় হয়ে গেছে সোমা। সংসারের ভালমন্দ এই বয়সেই বেশ বুঝে ফেলেছে।”

“বাস্তবতা মানুষকে অল্প বয়সেই ম্যাচিওর করে তোলে। ও কি বাড়িয়ে কিছু বলেছে?”

“কী বলেছে তা তুমি সবই বুঝতে পেরেছ বোধহয়?”

“না বোঝার কিছু আছে?”

“তবে তুমি ডিনারটা সেরে নাও তাড়াতাড়ি। কাজের লোকদের শুধু-শুধু আটকে রাখাটা ঠিক হবে না।”

“খুব যে সংসারের উপর দরদ দেখছি। ছেলের ওষুধে কাজ হয়েছে মনে হচ্ছে!”

পাশাপাশি শুয়ে আছে সোমা আর ঋষভ। সোমা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঋষভের চোখে ঘুম নেই।

আজ সন্ধেবেলা ঐশী তাকে খুব ভালো কোম্পানি দিয়েছে। গাড়িতে আজ ঐশীর ডান হাতখানা অনেকক্ষণ নিজের হাতের মুঠোয় ধরে রেখে দিয়েছিল ঋষভ। ঐশী বাধা দেয়নি। হাতটা ছাড়িয়েও নেয়নি। অনেকক্ষণ ধরে রাখার পর হাতের তেলোটা ঘেমে ওঠায় ঋষভই ছেড়ে দিয়েছিল। দু’জনে খুব গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে, তাই এক শরীর থেকে আর এক শরীরে উষ্ণতা ছড়ায়। গাড়ি থেকে নামার আগে ঐশীকে গভীর আবেগে বুকে টেনে নিয়ে একটা গাঢ় চুম্বন ওর ঠোঁটে এঁকে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল ঋষভের। কিন্তু সুখলাল বারবার আয়নার দিকে তাকাচ্ছে দেখে নিজেকে সে সংযত করে নিয়েছিল। ইদানীং কিছু কথাবার্তা কানে আসছিল ঋষভের, যেগুলো ফাঁস হওয়ার কথাই নয়। খুব গভীরভাবে ভাবলে সন্দেহের তিরটা সুখলালের দিকেই যায়। অতএব একটু সাবধানে চলতে হবে।

সেই চুম্বনের অভীপ্সাটুকু তাৎক্ষণিকভাবে চেপে রাখার অতৃপ্তিটা আজ এই মাঝরাতে আবার যেন চাড়া দিয়ে উঠেছে। কাজের ব্যস্ততা, কোলাহল, সাফল্য, অভিনন্দন এইসব নিয়ে অনেকটা সময় কেটে গেল। কেটে যাওয়ার কথা ছিল সামনের আরও বেশ কয়েকটা বছর। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বিধি বাম। একটা প্রতিরোধ গড়ে উঠছে তার বিরুদ্ধে। একটা দল তৈরি হয়েছে তার বিপক্ষে এই প্রতিষ্ঠানে। অবশ্য অল্পে সে ভেঙে পড়ার মানুষ নয়। সে চেয়ারম্যানকে বোঝাবে। একটা শেষ চেষ্টা করবে ঘুরে দাঁড়াতে। ঋষভ মানে, বিপদ যত বড়ই হোক না কেন, তা কখনও চিরস্থায়ী হয় না।

চুম্বনের অতৃপ্তি থেকে কিংবা এইসব ভাবনাচিন্তায় ঘুম মোটেই আসছে না। সোমার কাঁধে চাপ দিয়ে নিজের দিকে টানতে চাইল ঋষভ। সোমা নিজেকে শক্ত করল একটু। তারপর ওপাশ ফিরে শুল। ঋষভ একটা শ্বাস ছাড়ল নিঃশব্দে।

বাইরের আকাশ দেখা যায় না এই বেডরুম থেকে। এসি চলে বলে জানালায় মোটা পর্দা টানা। ঘুমের জন্য আর-একটু অপেক্ষা করে ঋষভ উঠে পড়ল বিছানা থেকে। ঘরের এককোণে একটা ছোট টেবিল। সে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসল চেয়ারটা টেনে।

টেবিলের উপর মায়ের কালো রেক্সিনে বাঁধানো অনেকদিনের পুরনো ডায়েরিটা রাখা। এতদিন এটা হিন্দুস্তান রোডের বাড়িতে সযত্নে আলমারিতে তোলা ছিল। সোমা অতীতের গর্ভ থেকে সেটা টেনে বের করে এনেছে। মা বাধা দেননি। ঋষভ পড়তে থাকে এলোমেলোভাবে। ডায়েরিতে একেবারে প্রায় শেষের দিকে মা এক জায়গায় লিখছেন, “আজ মনটা বেশ উতলা হয়ে আছে সারাদিন। ঋষি প্রায় এক সপ্তাহ ফোন করেনি লন্ডন থেকে। ওর কি পড়াশোনার চাপ যাচ্ছে? তা তো হওয়ার কথা নয়। এই তো সবে কয়েকদিন হল ওদের একটা সেমেস্টার শেষ হয়ে ছুটি চলছে। কোথাও হয়তো বেড়াতে গিয়েছে ঋষি। ওকে বলেছি স্ট্র্যাফোর্ড আপঅন অ্যাভনে শেক্সপিয়রের বাড়িটা দেখে আসতে। হয়তো ওখানেই গিয়েছে! আমারও যে ওসব দেশে যাওয়ার কী ইচ্ছে ছিল! সুকুমার অবশ্য ওসব জায়গা আগেই ছাত্রজীবনে ঘুরে এসেছে, যখন ব্যারিস্টারি পড়ত। ও আবার একটু ঘরকুনো। তাই দ্বিতীয়বার আমাকে নিয়ে যাওয়ার কোনও গরজ দেখায়নি। তবে সুকুমার আমার খুব ভাল বন্ধু। তবে সব পাওয়াই কি মানুষকে পূর্ণতা দিতে পারে? দিতে পারে পরিতৃপ্তি? এই আমিই তো বলতে গেলে সব পেয়েছি। চরিত্রবান স্বামী, বিত্ত-বৈভব, অঢেল পৈতৃক সম্পত্তি। সুকুমারের এত সম্মানও তো আমারই সম্মান। তবু আমি জানি সুকুমারও অতৃপ্তিতে ভোগে, আছে একাকিত্ব। যেমন আছে আমারও। সে কি ঋষি দূরে আছে বলে? না কি এই একাকিত্বের আর-এক নাম মৃত্যুভয় অথবা নিয়তি।

জানি না। তবে একা লাগে। যত বয়স বাড়ছে, ততই বুঝতে পারছি আমরা সকলেই বড় একা। আসলে আমরা প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ।”

**হৃদয় তৃষায় কাঁপে**

বিভাসের স্বপ্নে আজকাল প্রায়ই শ্যামারানি এসে উপস্থিত হয়। বিভাস এতদিন জানত না তার ছোটমাসির মনে জমা ছিল এত অগাধ দুঃখ। ছোটমাসি যেদিন বিভাসের মামার বাড়ি মথুরাপুরে আত্মহত্যা করে, তার মাত্র একমাস আগেই বাবা চলে গিয়েছেন অকস্মাৎ তাদের ছেড়ে। বিভাসের তখন বয়স মাত্র দশ।

বাবা বেঁচে থাকতে ছোটমাসি তাদের এ বাড়িতে প্রায়ই এসে থাকত। মার কাজেকর্মে সাহায্য করত। লোকে বলত, শ্যামা কালো, দেখতে ভাল নয়, তাই পাত্র পাওয়া যায় না। বিভাসের কিন্তু বরাবরই মনে হত, তার মাসির মুখটা ভারী মিষ্টি।

সেই কবেকার ছোটবেলার কথা। তবু এখনও সব স্পষ্ট মনে পড়ে। ছবির পর ছবি চলচ্চিত্রের মতো দেখতে পায় বিভাস। যেদিন ছোটমাসি বিষ খায়, তার ঠিক দু’দিন আগে পর্যন্ত সে এই চেতলার বাসাতেই ছিল, দিদির কাছে। একদিন দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে বিভাস দেখে মাসি বাক্স-প্যাঁটরা গোছাচ্ছে।

সে বাড়িতে ঢুকতেই শ্যামারানি বলে ওঠে, “তুই আমাকে বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে মথুরাপুরের ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে পারবি না?”

রান্নাঘর থেকে মা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, “এইটুকু ছেলে অতটা পথ একা ফিরে আসতে পারবে? আক্কেল নেই কোনও। চেতলা থেকে বালিগঞ্জ কখনও একা গিয়েছে ও? তোর যদি সে বোধবুদ্ধি থাকত মুখপুড়ি, তবে আমার এমন

Stampy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

সর্বনাশ করতে পারতিস তুই? তোকে বলে কী হবে!"

বিভাস তখনও পাড়ার একটা স্কুলে পড়ে। একা-একা অতদূরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তার তখনও হয়নি।

বিভাস কিছু না বুঝে বলে, "খুব পারব ছোটমাসি, চলো। কিন্তু এখন ক'টার সময় ট্রেন আছে? স্টেশনে গিয়ে বসে থাকতে হবে না তো?"

উমারানি স্বগতোক্তির মতো বলে, "ও ছেলেকে যখন নাচিয়েছ, তখন কি আর শুনবে আমার কথা? সর্বনাশ এলে এমন করেই আসে।"

ঝগড়া আরও বেশ কিছুক্ষণ চলেছিল। বাক্‌বিতণ্ডার পর শ্যামা একাই হাঁটা দেয় স্টেশনের দিকে। সবকিছু স্পষ্ট আর মনে পড়ে না বিভাসের। তবে ছোটমাসি ঘুরেফিরে আসে তার স্বপ্নে।

দিন যায়। দগ্ধ কলকাতার ফুটপাথ থেকে গরমের ভাপ ওঠে। সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়। আগুনের হলকায় দুপুরে পথ হাঁটা যায় না। একটু ছায়া খোঁজে মন। জলের জন্য হাহাকার করে হৃদয়। অনেকদিন বৃষ্টি নামেনি তেমন জোরে। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ থেকে চৌরঙ্গি। বিবাদী বাগ থেকে রেড রোড, হরিশ মুখার্জি থেকে রবীন্দ্রসদন হয়ে রেসকোর্স। রাসবিহারী মোড় থেকে গড়িয়াহাট, গোলপার্ক। দারুন অগ্নিবাণে বিদ্ধ এই কলকাতা শহরে তৃষিতের মতো ঘুরে বেড়ায় বিভাস। দু' চোখ আকুল হয়ে কাকে যেন খোঁজে। মনকে সে অলক্ষ্যে বারবার নাড়া দেয় কেন? কেন তার এই মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, কেন এই নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান?

অলকেন্দু ফোনে ডাকে বন্ধুকে। তারপর চৌরঙ্গির কোনও ঘুপচি বারে বসে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে-দিতে বলে, "ব্রেকিং নিউজটা তোকে দেব ঠিক বিয়ের দু'দিন আগে। এখন আর কোনও বাধা নেই। ওই স্কেপটিক চান্দ্রেয়ীকে লেঙ্গি মেরে দিয়েছি, রাস্তা ক্লিয়ার।"

বিভাসের খুব ইচ্ছে করে দময়ন্তীর উপখ্যানটা অলকেন্দুকে শোনাতে। কিন্তু কথা আটকে যায়। সেই বিহেসাবি কাহিনি নিজের অন্তরেই থেকে যায়।

অলকেন্দু তার বস কিংশুকের থেকে পাওয়া ঋষভ-সংক্রান্ত খবর বিভাসকে জানায়। তার কোম্পানির গন্ডগোলের কথা, এমনকী ঐশীর সঙ্গে ফ্লার্ট করার কথাও।

বিভাস ভাবে, ঋষভের সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করলে হয়। নিশ্চয়ই কারও উৎসাহ-আশ্বাস চাইছে সে। যত বড় কেউকেটাই হোক না, সে তো রক্তমাংসেরই একজন মানুষ। বিভাস যেদিন ঋষভের বাড়ি প্রথম গিয়েছিল, সেদিনই বুঝে গিয়েছিল যে, ঋষভ-সোমার দাম্পত্য সম্পর্কটি খুব মধুর নয়।

ঋষভের কাছ থেকে নেওয়া টাকাগুলো যত দ্রুত সম্ভব ওকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে। এখন বোঝা যাচ্ছে, কেন সেদিন ও এরকম অস্বাভাবিক আচরণ করেছিল। তাছাড়া ওই টাকা গরমিলের টাকা। ওই টাকায় বাড়ি কেনাটা উচিত হবে কি? বিভাস ভাবল টাকাটা ওকে দিয়েই আসবে।

বিভাস এর মধ্যে একদিন তার প্রকাশকের কাছে যায়। কর্ণধার রেবতীবাবুকে পাওয়া না গেলেও তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারী ছানা তালুকদার দোকানে বসে ছিল। ভদ্রলোক বেশ মজার মানুষ।

বিভাসকে দেখেই বলে, "বাবু কি টাকার সন্ধানে? তা সুখবর আছে। একটা মোটা অঙ্কের চেক লেখার কথা, তবে কর্তা আজ আসেননি, তাই আমার হাত-পা বাঁধা। আপনাকে আর একদিন আসতেই হবে।"

বিভাস জিজ্ঞেস করে, "আমার বই-টই কেমন বিক্রি হচ্ছে?"

ছানা একটা ভাউচারের বান্ডিলে গার্টার পরাতে-পরাতে বলে, "মন্দ নয়। ওই দেখুন না শো-কেসে ডিসপ্লে করা আছে। মশাই, আপনারা তো জানেন বইতে কী-কী মেশালে সেটা সাহিত্যও হয়, আবার ব্যবসাও হয়।"

"ঠেস দিচ্ছেন ছানাদা?"

"কী যে বলেন! আমরা চুনোপুঁটি লোক। আপনাদের মতো লোকজনকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করব আমরা! কাল এসে চেক নিয়ে যাবেন কিন্তু মনে করে। বাউন্ডুলেপনা করলে সংসার চলবে কেমন করে?"

আজ রবিবার। ভদ্রেশ্বরে জমি দেখতে যাওয়া হবে বলে সকাল-সকাল খেতে বসেছে বিভাস আর রুমকি। সাতসকালে ভাত গলা দিয়ে নামে না বিভাসের। রুমকির অবশ্য অভ্যাস আছে।

কিন্তু মা ওজর আপত্তি শুনবে না। বলল, "শুভ কাজে বেরনো। একটু ভাত মুখে দিয়ে যাওয়া ভাল।"

রাই পাশে বসে মা'র খাওয়া দেখছে। রুমকির আজ মনে খুব উৎসাহ। মেয়েকে খুশি-খুশি মুখে বলে, "আয় একগাল খেয়ে নে দেখি আমার সঙ্গে। মা, আপনিও বেলা করবেন না। আমাদের ফিরতে-ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে।"

"কেন, দেরি হবে কেন?" বিভাস ভুরু কোঁচকালো।

"দেরি তো হবেই। যে-লোক জমি দেখাবে তার বাড়িতে গেলে একটু বসতে তো বলবেই। হেনাদির আত্মীয় বলে কথা। তারপর খুঁটিয়ে ভাল করে দেখতে হবে সব কিছু। দরদস্তুর কথাবার্তা ভাল করে না করলে হয়?"

"তুমি তো বললে তোমাদের হেনাদি যখন বলছে, তখন সব পাকাই হয়ে গিয়েছে।"

"আহা, সে তো দাম! কিন্তু জমিটা কেমন, জায়গা কেমন, বড়রাস্তা থেকে কত দূর, বাজার, দোকান, স্কুল কোথায়, এসব জানতে হবে না?"

রাইও দু'জনের সঙ্গে যাওয়ার বায়না করছিল, কিন্তু সারাদিন ট্রেন জার্নির ধকল করে আগামীকাল স্কুল কামাই হওয়ার আশঙ্কায় তাকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গে নেয়নি রুমকি।

হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়তেই রুমকির মনটা আনন্দে নেচে উঠল। রবিবার বলে বসার জায়গাও পেয়ে গিয়েছে জানালার ধারে। এই ছুটির দিনেও এক-একটা ট্রেন এসে দাঁড়াতেই পিলপিল করে লোক নামছে। ফেরিওলারা মন-মজানো কথাবার্তা বলে প্যাসেঞ্জারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। কামরায় ঠাসাঠাসি ভিড়। তবু ট্রেন ছাড়ছেই না। অপেক্ষা করতে-করতে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে রুমকির।

সামনেই একটা বইয়ের স্টলে লোকজন বই ম্যাগাজিন হাতে তুলে নিয়ে দেখছে। তারপর না কিনেই রেখে চলে যাচ্ছে। ওখানে তার স্বামীর বই থাকতে পারে কি? না বোধহয়।

রুমকি আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, বিভাস অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে চোখ রেখে বসে আছে।

ট্রেন ছুটে চলেছে। তার সঙ্গে পাখা মেলে দেয় রুমকির ভাবনা, কল্পনা, ভবিষ্যৎ-চিন্তা।

ভদ্রেশ্বর স্টেশনেয় তত ভিড় নেই। তবে প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটতে হয় অনেকটা। স্টেশনের পশ্চিম দিক থেকে একটা রিকশা নিয়ে গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছল ওরা দু'জনে।

হেনাদির আত্মীয়র নাম শিবশঙ্কর পাইন। সকলে তাকে পাইনবাবু বলেই চেনে। তিনি তৈরি হয়েই ছিলেন। বেলা প্রায় সাড়ে তিনটে।

"এই সময় বাড়িতে না বসে কাজটা আগে সেরে আসা যাক। তারপর বসে চা খেতে-খেতে কথাবার্তা হবে। কী বলেন আপনারা?" পাইনবাবু জানতে চাইলেন।

"হ্যাঁ সেই ভালো।" রুমকির আর তর সইছে না।

একটা রিকশায় ওরা দু'জনে উঠল। পাইনবাবু সাইকেল নিলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, তবে শরীরে মেদ নেই, বেশ ছিপছিপে চেহারা। সাইকেল চালিয়ে তিনি রিকশার আগে-আগে যেতে লাগলেন। কয়েকটি অলিগলি পেরিয়ে পুরনো আমলের রংচটা বাড়ি দু'দিকে রেখে, রিকশা এসে পৌঁছল একটা চৌরাস্তার মতো জায়গায়। রাস্তার পাশে বাসনকোসন, ডিসপেন্সারি আর মণিহারি দোকান।

বড়রাস্তায় বেশ খানিকটা এসে বাঁ দিকে ঢুকল রিকশাটা। তারপর এবড়োখেবড়ো একটা ইটের রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে পাইনবাবুর দেখাদেখি থেমে গেল।

বিকেলের সূর্য পশ্চিমে হেলেছে। ফাঁকা জায়গাটায় একটু বাতাসও দিচ্ছে। চারপাশে কাছাকাছি কোনও বাড়ি নেই। শুধু রুমকির কেন, বিভাসেরও ভারী ভাল লেগে গেল জায়গাটা। এত খোলা মাঠ। এত আলো, বাতাস।

পাইনবাবু ওদের মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। বললেন, "যতটা খোলামেলা দেখছেন ঠিক ততটা কিন্তু নয়। এই ছ' বিঘে জমির সবটাই প্রায় বিক্রি হয়ে গেছে। এক একটা প্লট তিন-চার কাঠা করে। এখান দিয়ে রাস্তা হবে। আসুন দেখাই আপনাদের। তবে আপনাদের লাক ভাল। যেটা আপনাদের জন্য রেখে দিয়েছি তার পুব দিকটা খোলা। ওখানে কাছাকাছি বাড়ি ওঠার কোনও চান্স নেই। আলো-বাতাস পাবেন যথেষ্ট।"

"প্লট সব বিক্রি হয়ে গেছে বললেন, কিন্তু বাড়ি উঠবে কবে?" রুমকি জানতে চাইল।

"সামনের শীতে একবার আসুন না। চিনতেই পারবেন না। দেখবেন ছাদে কাপড় মেলা, বারান্দার টবে গাঁদা ফুলের গাছ। আর বাড়ির সামনের গেটে বোগনভিলা। হা হা হা," নিজের রসিকতায় নিজেই হাসেন পাইনবাবু।

বিভাস বলল, "যেখান থেকে আমরা ভিতরে ঢুকলাম, মানে বড়রাস্তাটা এখান থেকে কতদূর হবে?"

"তা দেড় দু' কিলোমিটার মতো হবে।"

"রাস্তাটা তো বেশ ভাঙাচোরা।"

"থাকবে না। রাস্তা পাকা হবে, মিউনিসিপ্যালিটির স্যাংশন হয়ে গিয়েছে। আসুন, এবার নিজেদের জমিটায় এসে দাঁড়ান। ওই দেখুন ওদিকে গঙ্গার ধারে ইটভাটা। চিমনি দেখতে পাচ্ছেন?"

কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রুমকি। আনন্দে আবেগে তার চোখে খালি জল আসছে। সত্যি এই জমি তাদের হবে। এখানে মনের মতো একটা বাড়ি


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

উঠবে। সামনে ছোট্ট একটু বাগান। ঘরের দেওয়ালে রঙিন চুনকাম। রান্নাঘরে কাঠের তাক। হাত ধোওয়ার ছোট্ট বেসিন। বিছানায় জয়পুর প্রিন্টের বেডকভার পাতা। সুন্দর সোফা আর টিভি।

চোখ বুজে দৃশ্যটা একবার কল্পনা করল রুমকি। ভিজে চোখের কোণ উপচে জল গড়িয়ে পড়ল গালে। সকলের অলক্ষ্যে মুছে নিল রুমকি।

পড়ন্ত সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে তারা একফালি জমির উপরে।

"এবার ফেরা যাক," খানিক পরে বলল বিভাস।

"আর-একটু ঘুরে দেখতে পারেন চারপাশটা। আসুন দেখাই, যারা প্লট কিনে নিয়েছে, তারা কেমন খুঁটি পুঁতে দিয়েছে। নইলে বেহাত হয়ে যেতে পারে জমি।"

"এখানে পার্টির উপদ্রব আছে?"

"সে কোথায় নেই! তবে আমাকে এ অঞ্চলে সবাই মানে। সব দলই। ও নিয়ে আপনাদের ভাবতে হবে না। নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।"

"তোলাবাজ?"

"বলছি না, আপনারা আমার লোক। কেউ ঘাঁটাবে না আপনাদের। জমির দামের মধ্যেই সব ধরা থাকবে। ভাগ পেয়ে যাবে সবাই।"

"কত করে দেবেন? আমরা কিন্তু মধ্যবিত্ত পাইনবাবু। একটু বুঝে শুনে...হেনাদি নিশ্চয়ই বলে দিয়েছেন," রুমকি আবদারের গলায় বলে।

"ওসব কথা এখানে হয় নাকি? বাড়িতে চলুন। চা-টা খেতে-খেতে সব কথা হবে। হেনা যখন আপনাদের পাঠিয়েছে, যা-তা একটা দাম হেঁকে বসলেই হবে?"

বিভাস কয়েক হাজার টাকা আজ সঙ্গে নিয়ে এসেছে। রুমকি ভাবে, ঈশ্বরের আশীর্বাদে যদি বাড়িটা সত্যি বানিয়ে ফেলতে পারে তারা, তবে জীবনটা সত্যিই বদলে যাবে। তখন আর সে কোনওদিন বিভাসের মুখের উপর চেঁচিয়ে কথা বলবে না। খুব আদর করবে, ভালমন্দ রান্না করবে প্রতিদিন। সন্ধেবেলা গঙ্গার ধারে আর রবিবারে বা ছুটির দিনে ব্যান্ডেল চার্চে বেড়িয়ে আসবে সে, রাই আর বিভাস। জীবনে তখন আর কোনও দুঃখ থাকবে না। খেদও থাকবে না। ভাগ্যিস হেনাদি জায়গাটার সন্ধান দিয়েছিল তাকে। আজ যে কী আনন্দের দিন!

ঋষভের দেওয়া টাকাগুলো একদিন গুনে দেখেছিল বিভাস। পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই টাকা হিসেবের বাইরে। এই টাকা কোনওদিন ফেরত না দিলেও চলবে। প্রকাশকের দেওয়া চেকটা জমা পড়ে আছে অ্যাকাউন্টে। দুটো মিলিয়ে হচ্ছে প্রায় সত্তর হাজার টাকা। প্রয়োজনে আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করতে তার খুব একটা অসুবিধে হবে না। জমিটা তাহলে তাদের হয়েই যাচ্ছে। রুমকির স্বপ্ন সত্যি হচ্ছে তাহলে! এতে অবশ্য তার নিজের কোনও হাত নেই। সব যেন কী করে হঠাৎই হয়ে গেল। জীবন যেন একটু সুখের মুখ দেখছে। রুমকি তো বটেই, তার নিজেরও বেশ ভাল লাগছে। দময়ন্তীর প্রতি বিচ্ছেদবেদনা ছাপিয়েও কোথায় যেন এক আশ্চর্য ভাল লাগার স্পর্শ। দিনান্তের রোদ আজ এই মুহূর্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে বেগবান জীবনের যাত্রাপথে অঢেল আলো, অফুরান ভালবাসা আর দুর্বার প্রাণের স্পন্দন।

**নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান**

কয়েকদিন ধরে সারা অফিসে শুধু কানাকানি আর গুঞ্জন চলছে। প্রধান পাত্রপাত্রী ঋষভ এবং ঐশী। সুখলালই নাটের গুরু। অফিসে কথাটা ঘুরতে-ঘুরতে নিচু থেকে অতিদ্রুত পৌঁছে গেছে উপরমহলে। এমনকী, চেয়ারম্যান অরবিন্দ রায়ের কানেও।

সায়ন্তনের কাছেও ঐশী অধরা। অফিসে এসেই মিটিং সেরে সায়ন্তনকে বেরিয়ে যেতে হয় রোজ। ঐশীকে ধরাই যায় না। বারোতলায় ওঠার সুযোগ হয় না। আর ফোন করলেই ঐশী বলে, "ব্যস্ত আছি। বিকেলে ফোন কোরো। কেমন?"

অভিমানে বুক ভরে যায় সায়ন্তনের। রাগও হয় প্রচণ্ড। একরাশ বিরক্তির বোঝা সে বয়ে নিয়ে যায় বাড়িতেও। মায়ের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয় সামান্য বিষয় নিয়ে।

দু'-একদিনের মধ্যে অবশ্য ঐশীর একটা ফোন এল।

"রাগ করেছ সায়ন?"

"মোটেই না। বলো কী বলবে?"

"আজ এখনই একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে?"

"তুমি তো অফিসে। তারপর ওই বারোতলায়। ওখানে আমি যাবই না।"

"না না সায়ন, আমি অফিসে নেই। একদিনের ছুটি নিয়ে আজ আমি বাড়িতে। বলো কোথায় দাঁড়াব?"

সেদিন ঐশী যতটা উচ্ছল ততটাই বিরসমুখে বসেছিল সায়ন্তন।

"সায়ন, আমি যদি একটা ভেঙে পড়া মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করি, সেটা কি খুব দোষের? আমি কি তোমাকে একটুও ভুলে গেছি? দু'দিন দেখা না হলে, কথা না বললেই সব সম্পর্ক ভেঙে যায়?"

"আমি তো তোমার কাছে কোনও কৈফিয়ত চাইনি।"

"না চাইলেও আমাকে দিতে হবে। তুমি আমাকে শুধু-শুধু ভুল বুঝছ।"

"ভুল বোঝাবুঝি নয় ঐশী। কিন্তু কোথাও একটা অনিয়ম হয়ে গিয়েছে।"

ঐশী এবার অধৈর্য স্বরে বলে, "কিচ্ছু হয়নি সায়ন। বিলিভ মি। আমি যেমন তোমার মানসিকতাটাও ভাল করে বুঝতে পারছি, তেমনি পারছি ঋষভ স্যারেরটাও। উনি যদি আগের মতো এই গ্রুপের হাল না ধরেন, তবে এই কোম্পানি থাকবে? আর সেটা যদি সত্যি ঘটে, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ কী হবে একবারও ভেবে দেখেছ?"

সায়ন্তন শুকনো হেসে বলে, "আমরা সামান্য লোক, জাহাজের খবর নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কী দরকার আছে ঐশী? এই কোম্পানি অত সহজে ডুববে না।"

"এখনও তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না। কাশীনাথ সান্যালের গ্রুপের লোকেরা বা নাগরাজন অতীশের মতো লোকেরা এসে স্যারের গ্রুপের সব লোকদের একে একে ভাগাবে। নিজের দল ভারী করবে।"

সায়ন্তন বিস্মিত হয়ে বলে, "তুমি এখনই এতদূর ভেবে নিয়েছ? তবে তোমার ভাবনাটা কিন্তু অমূলক নয়।"

"বলছ?"

"বলছি।"

"তাহলে এক কাজ করো। হাতে হাত মেলাও। চলো আমরা দু'জনে মিলে দেখি একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে তার হারানো মনোবল আবার ফিরিয়ে দিতে পারি কি না। চলো স্যারের কাছে যাওয়া যাক।"

ঋষভ নিবিষ্টমনে ল্যাপটপ খুলে ইমেল করছিল। কয়েকজন বিদেশি প্রযুক্তিবিদের আসার কথা ছিল নয়ডা প্রজেক্টের ব্যাপারে। তাদের আসাটা একেবারে না করে দিলেও আপাতত মুলতুবি রাখতে বলতে হচ্ছে। না বলে দিলেই পারে ঋষভ, তবু কোথায় যেন মনের মধ্যে ক্ষীণ একটা আশা এখনও রয়েছে। হয়তো চেয়ারম্যানের হঠাৎ মত বদলাতেও পারে। নিজের সিদ্ধান্তটা ভুল বুঝে তিনি ঋষভকে ফোন করতেও পারেন যে কোনওদিন।

ঋষভ ভাবতে-ভাবতে কাজ করে চলেছে। কাজে তার কোনও ক্লান্তি নেই। কিন্তু শুধু এখন যেন একটা হতাশার বোঝা ঘাড়ে চেপে বসেছে। আর সেই বোঝাটা তাঁর দৌড়কে শ্লথ করে দিতে চাইছে কেবলই।

চেয়ারম্যানের কথা ভাবতেই আশ্চর্যজনভাবে ঠিক সেই সময় তাঁরই একটা কল এল ঋষভের ডিরেক্ট লাইনে।

"মিটার, হাউ আর ইউ দিস মর্নিং?"

"গুড মর্নিং স্যার। আই অ্যাম ওকে। বলুন স্যার কী বলবেন।"

"এই তো তোমার গলার স্বর বেশ লাইভলি লাগছে। যা শুনলাম তা ঠিক নয় তাহলে?"

"কী শুনেছেন স্যার?"

"সেটা না হয় পরে বলব। আগে বলো, নয়ডার প্রজেক্ট বাবদ তুমি কিছু টাকা তুলেছিলে অ্যাকাউন্ট্স থেকে? ক্যাশ?"

"হ্যাঁ তুলেছিলাম। আপনি তো জানেন স্যার, লাইসেন্স আর পারমিট পেতে কত জায়গায় কত ঘুষ দিতে হয়। তারপর নানারকম এন্টারটেনমেন্ট আছে, যা চেকে পেমেন্ট করা যায় না।"

"জানি জানি। কিন্তু একটা হিসেব তো অ্যাকাউন্ট্স চাইতেই পারে তোমার কাছ থেকে। ইন ফ্যাক্ট তা চেয়েওছে, কিন্তু তুমি পাত্তা দাওনি। তোমার নামে আশি লাখ টাকার একটা সাসপেন্স ব্যালান্স পড়ে আছে। ইজ ইট ট্রু ঋষভ?"

"ট্রু স্যার।"

"খুশি হলাম কথাটা লুকোলে না বলে। তুমি তাহলে টাকাটার একটা হিসেব করে ভাউচার সমেত অ্যাকাউন্ট ক্লিয়ার করে নাও, বাই দিস উইকএন্ড, ওকে?"

ঋষভের মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে। এসির ঠান্ডা বাতাসও যেন গায়ে লাগছে না। অপমানে তার চোখ-মুখ জ্বলছে। শ্বাস পড়ছে দ্রুত।

"কী হল ঋষভ? ডু ইউ হিয়ার মি?"


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

"ইয়েস স্যার।"

"এ নিয়ে ফারদার কোনও রিপোর্ট যেন আমার কাছে না আসে। এখনও বলছি, ইউ আর ব্রিলিয়ান্ট। ইউ আর ইনএভিটেবল টু সেবা গ্রুপ। তোমার মেধা, তোমার পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই।"

"এত বড় একটা কমপ্লিমেন্টই যখন দিলেন স্যার, তখন একটা রিকোয়েস্ট করতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে।"

"নয়ডার প্রজেক্টটা রিকনসিডার করে দেখুন না স্যার। আর-একটিবার ভেবে দেখুন।"

"মিটার, প্লিজ ওই একটা রিকোয়েস্ট অন্তত আমাকে তুমি কোরো না।"

"কী এমন প্রবলেম স্যার, যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অথচ আমি পাচ্ছি না?"

"বলতে পার। আপাতত আইডিয়াটা ছেড়ে কাজে মন দাও। ইউ উইল ফিল বেটার।"

"কাজে আমার মন নেই, একথা মনে হচ্ছে কেন আপনার?"

"সে কথাটাই তাহলে এখন বলি?"

"বলুন।"

"ব্যাপারটার মধ্যে আমি অবশ্য কিছু অবজেকশনেব্‌ল দেখছি না। ওটা শত্রুরা রটনা করছে। দু'দিন পরেই ওরা চুপ করে যাবে। তবে তুমি পাঁচটার আগে অফিস থেকে বেরিয়ে যেয়ো না রোজ। আর সন্ধেবেলা চেম্বার অফ কমার্সের মিটিংয়ে বা ক্লাবে বিজনেস ম্যাগনেটদের সঙ্গে মিট করাটা একেবারে বন্ধ করে দিও না। পারলে ওই মেয়েটি, ঐশী না কী যেন নাম, ওকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। শি ইজ গুড। ভেরি চার্মিং।"

"স্যার, ঐশী জাস্ট আমাকে একটু কোম্পানি দেয়। এর বেশি কিছু নয়।"

"ইউ আর আ কাওয়ার্ড। ওর সঙ্গে বেশিটাতেই বা আপত্তি করছে কে?"

ঋষভ বুঝতে পারছে, চেয়ারম্যান সাহেব তাকে হাসিখুশি রাখতে চাইছেন। ভোলাতে চাইছেন তার পরাজয়, তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার যন্ত্রণা।

আরও দু'-একটা কথা বলে তিনি ফোন রেখে দিলেন। ঋষভ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তার সামনে ল্যাপটপটা খোলা। স্ক্রিনসেভারে একটা বৃত্ত একাধিক বলয় সৃষ্টি করে ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে।

আজ ঐশী অফিসে আসেনি। বাড়িতে ওর কী বিশেষ কাজ আছে বলে ছুটি নিয়েছে। ঐশী-বিহীন আজকের দিনটায় কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতে চাইছে ঋষভ। কিন্তু চেয়ারম্যানের ফোনকল একটা ছন্দপতন ঘটিয়ে দিল। যতই তিনি রসিকতা করুন, ওঁর দৃঢ় কণ্ঠস্বরে, "মিটার, ওই একটা রিকোয়েস্ট অন্তত আমাকে তুমি কোরো না" কথাটা যেন বুকের মধ্যে তুফান তুলছে।

এসময় ঐশী পাশে থাকলে ভাল হত। পরপর বেশ কয়েকদিন ঋষভ আর ঐশী ঘুরে বেড়িয়েছে কলকাতার বিভিন্ন জায়গা। ঐশীকে হঠাৎ বাড়িতে ফোন করে চমকে দিয়েছে। বারবার একটা কথা বলি-বলি করেও শেষ পর্যন্ত বলে উঠতে পারেননি ঋষভ। না বললেও ঐশী হয়তো কথাটা বুঝে নিয়েছে। একবারও সে আপত্তি করেনি তার সঙ্গে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে। প্রশ্ন করেনি, তর্ক করেনি। ঋষভের হাতের মুঠো থেকে নিজের হাতটা জোর করে ছাড়িয়েও নেয়নি।

আজ ঐশীর জায়গায় বসে ফোনকল রিসিভ করছে যে-অবাঙালি ছেলেটি, সেই রাহুল এই অফিসেরই পিওন মধু সিংহর ছেলে। রাহুল মাস্টার্স কমপ্লিট করে যখন চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে, তখন মধু এসে একদিন ঋষভের পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ঋষভ ছেলেটিকে এইচআর ডিপার্টমেন্টে একটা সাধারণ চাকরি দেয়। এরকম আরও কতজনের কথা ঋষভের মনে পড়ে। জেনারেটর রুমের শিবনারায়ণ, লিফটম্যান অনন্ত, ক্যান্টিনের ম্যানেজার সুনন্দ এরা প্রত্যেকেই একদিন ঋষভকে ডাকত 'দাদা' বলে। যখন-তখন যে-কোনও অসুবিধের সময় ওদের সাহায্য করেছে অন্তর থেকে। গিয়েছে ওদের টালি ছাওয়া ঘুপচি ঘরে। তখন সে এখানে নতুন ঢুকেছে। গায়ে বিলেতের গন্ধ লেগে আছে তখনও। তবু এরা ছিল সব তার আপনজন। কাছের মানুষ।

ধীরে-ধীরে এল পরিবর্তন। ঋষভ হয়ে উঠল বড়সাহেব। পোশাকআসাক, চালচলন বদলে গেল সব কিছুই। মনে আছে, এদের সকলের কথা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনত সোমা। ওদের কারও অসুখের কথা শুনলে আলমারি থেকে টাকা বের করে ঋষভের হাতে গুঁজে দিয়ে বলত, "ওষুধ কিনে দিও। টাকা দিলে খরচ করে ফেলবে। আর অসুখ যদি বাড়ে আমাকে বোলো। আমাদের এনজিও থেকে টিম যাবে। দরকার হলে হাসপাতালে ভর্তি করে দেব।"

ল্যাপটপটা খোলাই রয়েছে। ঋষভ এলোমেলো চিন্তা করে যাচ্ছে।

"মে আই কাম ইন স্যার?"

দরজাটা অল্প ফাঁক করে মুখ বাড়ায় মার্কেটিং-এর রাজা দাশগুপ্ত। মুখে অমায়িক হাসির প্রলেপ।

একটু বিরক্ত বোধ করলেও ঋষভ সেটা বুঝতে দিল না মুখের ভাবে। বলল, "আসুন দাশগুপ্ত। তারপর, কাজকর্ম কীরকম চলছে?"

রাজা দাশগুপ্ত প্রায় টাক পড়ে যাওয়া মাথায় হাত বোলায়, "আর কাজ! ডিপার্টমেন্টে তো আজকাল ডিসিপ্লিন বলে কিছু নেই। আপনি স্যার ইয়ং জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের রিক্রুট করেছেন, সে খুব ভাল কথা। কিন্তু তাদের মধ্যে লয়ালটি বলে একটা ব্যাপার থাকতে হবে তো? আমাদের মতো দু'-একজন যারা ওল্ড অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সড রয়েছি, তাদের কথা এরা গ্রাহ্যই করে না।"

"তাই নাকি?"

রাজা একসময় ঋষভের পাশাপাশি বসে একসঙ্গে কাজ করেছে। টিফিন করেছে, ইংরেজী ছবি দেখেছে অফিস থেকে বেরিয়ে। এখন ঋষভ অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। রাজাকে সে বিশেষ পাত্তা দেয় না। রাজাও ঋষভকে মোটেই ভয় পায় না। বস বলে একটু সমঝে চলে, স্যার-স্যার করে, ব্যস!

এখন ঋষভের শনির দশা চলছে। এই সময় সুযোগ বুঝে রাজা এসেছে বহুদিনের হেরে যাওয়ার, পিছিয়ে পড়া অপমানের প্রতিশোধ নিতে। মুখে অবশ্য সেটা মোটেও প্রকাশ করছে না।

রাজা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে। ভাবখানা দেখায় যেন সে-ও ঋষভের মতোই কোনও পদে বহাল। এই সাহস আগে তার ছিল না, এখন ঋষভের পজিশন নড়বড়ে হয়েছে দেখে আবার নিজমূর্তি ধারণ করেছে।

রাজা চোখ মটকে বলে, "সে কথাটাই তো বলতে আসা। বস, মনে পড়ে একসময় আমরা দু'জনে একসঙ্গে কত কাজ করেছি? এই সেবা গ্রুপ তখন খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছে। আপনি হাল ধরলেন তাই না..."

একটা ফোন এল। সেটা রাখতে-রাখতেই আর-একটা। একবার ল্যান্ডলাইনে, আর একবার মোবাইলে। আসল কথাটা পাড়ার সুযোগই পাচ্ছে না রাজা দাশগুপ্ত। প্রথমে একটু ভণিতা না করে এগোয় কী করে?

"হ্যাঁ রাজা বলো কী বলবে? আজ লাঞ্চের পরই একটা মিটিং আছে। খুব ইমপর্ট্যান্ট মিটিং সেটা। এখনও এজেন্ডায় চোখ বোলাতে পারিনি। তুমি একটু সংক্ষেপে বলো। এনি প্রবলেম?"

কথায় বলে মরা হাতি লাখ টাকা। সিংহাসন টলছে, তবু বড়-বড় মিটিংয়ের খামতি নেই। কাশীনাথ সান্যালের অন্তরঙ্গ রাজা দাশগুপ্তর ভিতরটা ঈর্ষায় জ্বলতে থাকে।

"প্রবলেমটা ঠিক অফিসের নয় বস। আবার অফিসও বলা যায়। আপনার ওই সেক্রেটারি মেয়েটি, ও আজ আসেনি দেখলাম। ছুটি নিয়েছে বুঝি?"

"হ্যাঁ। কোনও ফাইল দরকার? আজ রাহুল আছে ওর জায়গায়। বললে দিয়ে দেবে।"

"না স্যার রাহুল নয়। কথাটা ওই ঐশীকে নিয়েই। আজ ঐশীও আসেনি আর আমাদের সায়ন্তন ছেলেটাও আসেনি। আসেনি মানে, এসেছিল। তারপর আউটডোরে যেখানে যাবে বলে বেরিয়ে গেল, সেখানে ফোন করে জানলাম যায়নি। ও যেসব ডিলারকে হ্যান্ডেল করে, সব জায়গাতেই ফোন করলাম, কোথাও যায়নি।"

"ওকেই ফোন করলে পারতে।"

"করেছিলাম। সুইচ অফ করে রেখে দিয়েছে। অথচ ডিউটিতে থাকার সময় মোবাইল বন্ধ রাখাটা রীতিমতো অপরাধ।"

"সবই বুঝলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে ঐশীর প্রসঙ্গ উঠছে কেন? তুমি কি..."

"স্যার, বহুদিন ধরে ওদের দু'জনের মধ্যে কোর্টশিপ চলছে। সম্ভবত দু'-একমাসের মধ্যে ওরা বিয়েও করবে। আপনাকে বলেনি বুঝি?"

কয়েকমাস আগে দিল্লি থেকে ফেরার সময় প্লেনটা যখন দুর্ঘটনার মুখে পড়ে, তখন মুখের উপর চাপা দেওয়া হাত দু'খানা যেভাবে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল, অনেকটা সেরকমভাবেই এক মুহূর্তের জন্য কি-বোর্ডের উপর রাখা ঋষভের হাতের আঙুলগুলো কেঁপে উঠল। এবং ঋষভের মুখের অভিব্যক্তিগুলো যে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, এটা রাজার নজর এড়াল না। ওষুধ ধরেছে দেখে রাজা মনে-মনে বেশ খুশি হল।

মুখে একটু চিন্তার রেশ টেনে বলল, "আসলে সায়ন্তন ছেলেটা এমনিতে খুব ভাল। বেশ সহজ সরল। ওই ঐশী মেয়েটাই ওকে স্পয়েল করছে। আমি কত সাবধান করেছি। বুঝিয়েছি, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। আসলে প্রেমে মজে গেলে যা হয় আর কী!"

"আমার হাতে এখন অনেক কাজ। সময় খুব কম। তুমি এখন যাও দাশগুপ্ত। এ নিয়ে আর একদিন কথা বলা যেতে পারে। তবে এটা কমপ্লিটলি ওদের পার্সোনাল ব্যাপার।"


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

"তাই বলে অফিস ফাঁকি দিয়ে...না না, এটা মানতে পারলাম না বস। আমার অডাসিটি মাপ করবেন।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাজা। বেরনোর আগে দরজার কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস না হলে ঐশীর মোবাইলে একটা কল দিয়ে দেখুন না আমি বানিয়ে বলছি কি না। আপনি স্যার শক্ত না হলে আরও পেয়ে বসবে।"

ঋষভ হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ল, "ইউ বাস্টার্ড, গেট আউট অফ মাই রুম। ডোন্ট স্পয়েল মাই টাইম, আন্ডারস্ট্যান্ড?"

রাজা এটাই চাইছিল। এই বিস্ফোরণটা। টাইমবোমাটা তাহলে যথাসময়ে ফেটেছে। সে আর দাঁড়াল না। কাশীনাথ সান্যাল আর নাগরাজনকে এখনই ধরতে হবে। ওরা বসে আটতলায়। লিফটে বারোতলা থেকে নীচের দিকে নামতে লাগল রাজা।

মোবাইলে ঐশীকে ধরার চেষ্টা করতে লাগল ঋষভ। কিন্তু পারল না। সুইচড অফ। রাজার কথাই মিলে যাচ্ছে। আজকের ছুটি নেওয়ার কারণ হিসেবে সকালে ফোন করে যেটা জানিয়েছিল ঐশী সেটা যে সাজানো গল্প, সেটাও এখন প্রমাণিত হয়ে গেল। আজ নাকি ওর বাবাকে নিয়ে হাসপাতালে চেক-আপে যাবে!

আজ দিন দশেক ধরে ঋষভ আর কোনওদিকে তাকায়নি। ঐশীকে নিয়ে শুধু ঘুরে বেড়িয়েছে। মনের সব যন্ত্রণার কথা খুলে বলেছে, পরামর্শ চেয়েছে। আর আশ্চর্য, ঐশীও পরম বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে! একটু-একটু করে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে তার হারানো মনোবল, তার আত্মবিশ্বাস, তার ব্যর্থতাবোধের গ্লানি। অনেকখানি জুড়িয়ে দিয়েছে তার মনের জ্বালা।

এই কয়েকদিনে রাতে বিছানায় শুয়ে কতবার মনে হয়েছে এই সময় সোমার বদলে তার পাশে যদি শুয়ে থাকত ঐশী। নিদ্রাহীন চোখে বুলিয়ে দিত ঘুমের পরশ।

ঘুম না এলে মাঝরাতে উঠে সে পড়তে বসেছে তার মায়ের ডায়েরি। সেই লেখাও তাকে দিয়েছে প্রাণশক্তি, প্রেরণা। ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে শৈশবের অনাবিল স্মৃতিময় দিনগুলিতে।

মা পেরেছেন। আর পেরেছে ঐশী। এইভাবে আবার উঠে দাঁড়াতে চাইছিল ঋষভ।

ফোন বেজে উঠল। রীতিমতো বিরক্তিকর লাগছে এই মুহূর্তে তীব্র আওয়াজটা। নম্বরটা না দেখেই সে কানে লাগাল যন্ত্রটা।

"হ্যালো, ঋষভ স্পিকিং।"

"হাই ড্যাড।"

"ওহ মাই ডার্লিং, জিৎ। কেমন আছ বাবা?"

"ফাইন। ড্যাড, তোমার ই-মেলটা পেয়েছি। আমার সব রেডি। চার তারিখ মুম্বই হয়ে কলকাতা পৌঁছচ্ছি। মর্নিং ফ্লাইট। এয়ারপোর্টে তুমি আর মা আসছ তো?"

"অবশ্যই। খুব সাবধানে আসবে। লাগেজ কি বেশি থাকবে? ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে পঁচিশ কেজির বেশি হলে এক্সেস লাগেজের ভাড়া দিতে হয় জানো তো?"

"অত হবে না। তবে দিন পনেরো থাকব, কিছু তো হবেই। আমি বাড়িতে এলে কিন্তু তোমাকে অফিস ছুটি নিতে হবে।"

"নেব নেব। আচ্ছা রাতে কথা হবে। একটা ফোন এসেছে। ছাড়ছি।"

"সরি, তুমি অফিসে, না? বাই।"

"বাই।"

একটা সাপ্লায়ার কোম্পানির এমডি ফোন করেছে। নতুন এগ্রিমেন্ট করতে চায়। কীভাবে ট্যাক্স ডিউটি নিয়ে দু'পক্ষে রফা করা যায়, ক্রেডিট টার্মস আরও একটু শিথিল করা যায় কি না ইত্যাদি। এসব কচকচি সত্যিই আর ভাল লাগছে না। দু' সপ্তাহ আগেও লাগত। এখন আর লাগছে না।

ঐশীর ব্যাপারটা সে সহজে মেনে নিতে পারছিল না। তবু জিতের ফোনটা যেন একঝলক ঠান্ডা বাতাস হয়ে জুড়িয়ে দিল বুকের ক্ষত। সেটা অবশ্য কিছুক্ষণের জন্যই। এখন আবার ঐশীর কথা মনে পড়ছে। বারবার।

ঋষভ ভিতরে-ভিতরে অস্থির হয়ে ওঠে। তার বুকের বাঁ দিকটায় চিনচিন করছে। কপালে ঘাম জমছে। এতদিন ঋষভ শুধু কাজ করে এসেছে। একমনে একনিষ্ঠ হয়ে প্রাণ ঢেলে কাজ করেছে। সামনের সব বাধা, সব সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা, আক্রমণ পরাহত করে এগিয়ে গিয়েছে। তার দৌড় থামেনি। কোনও সমালোচনা বা স্তুতি তার কাজের চেয়ে বড় হয়ে ওঠেনি কখনও।

কিন্তু ঋষভ কী পেল তার বদলে? পেল সম্মানজনক পোস্ট, প্রচুর দায়িত্ব। আর্থিক দুশ্চিন্তামুক্ত বিলাসবহুল জীবনযাপনের হাতছানি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এসব আসলে শূন্যেরই উদ্যান।

ঋষভ কার কাছে যেন শুনেছিল, মানুষ আদতে গোটাকয়েক বল নিয়ে খেলা করে সারা জীবন। সেগুলি হল তার অফিসের কাজ, সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক, তার পরিবার, সময় এবং স্বাস্থ্য। এর মধ্যে কাজের বলটাই শুধু রাবারের তৈরি, যেটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিলেও বাউন্স করে আবার নিজের কাছেই ফিরে আসবে। আর বাকিগুলো সব ভঙ্গুর কাচ দিয়ে নির্মিত। সেগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেই ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। সম্পর্ক, পরিবার, স্বাস্থ্য আর সময় কখনও ফিরে আসে না। বিকৃত হয়ে যায়। অতএব কাজের অছিলায় জীবনের এই বাকি দিকগুলি কখনওই অগ্রাহ্য করা উচিত নয়।

আজ তার মনে হয়, এর চেয়ে দামি কথা আর কিছু হতে পারে না। এর চেয়ে খাঁটি সত্য আর কিছুই নেই তার কর্মময় ব্যস্ত জীবনে।

সে সত্যিই ক্লান্ত, শ্রান্ত। এখনই উঠে একবার ডাক্তারের কাছে চেক-আপে যাওয়া দরকার। বুকের চিনচিনে ব্যথাটা ক্রমশ বাড়ছে। অফিস থেকে বেরনোর আগেই ঋষভের মোবাইলটা বেজে উঠল। বিভাস হালদার।

"হ্যাঁ বিভাস। কেমন আছ?"

"তুমি কেমন?"

"এই মুহূর্তে তেমন একটা ভাল নেই। একটু ডাক্তারের কাছে চেক-আপ করাতে যাচ্ছি।"

"তাই নাকি? শরীর কি বেশি খারাপ? আর একদিন ফোন করব না হয়।"

"দরকার ছিল কিছু? বলতে পার আমাকে..."

"তোমার সেই টাকাটা। ওটা ফেরত দিতে চাই।"

"অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বিভাস? আমি তো এখনই টাকাটা চাইনি। থাক না তোমার কাছে।"

"আমার বই থেকে কিছু টাকা পেয়েছি। আর তাছাড়া অত টাকা লাগবে না। শেষে ফেরত দিতে পারব না হয়তো, খরচ করে ফেলব।"

"তোমায় তো বলেছি বিভাস, ও টাকাটা হিসেবের বাইরে। তাছাড়া তোমার লেখার টাকা আর কতই বা হবে? রেখে দাও ওটা বিভাস।"

"হুট করে চাইলে কিন্তু দিতে পারব না ঋষভ।"

"আচ্ছা ধরো, চাইলামই না। হল তো? এখন রাখছি। আমার ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্টের দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

চেক-আপ করে তেমন গুরুতর কোনও সমস্যা ধরা পড়ল না। প্রেশারটা অবশ্য বেশ হাই হয়ে রয়েছে। ইসিজি-র তাৎক্ষণিক একটা রিপোর্টও নিয়ে নিলেন ডাক্তারবাবু। তারপর গোটা দুয়েক ট্যাবলেট লিখে দিলেন।

নার্সিং হোম থেকে ফেরার পথে উৎকণ্ঠাটা আর তেমন অনুভব করছিল না ঋষভ। শরীরটাও যেন আর বিদ্রোহ করে উঠছে না। নার্সিং হোমে বসে মাঝে-মাঝেই মায়ের মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সামনের সপ্তাহ থেকে মাকে আবার কেমো দেওয়া শুরু হবে। ঋষভ দেখেছে কেমোথেরাপির পর অনেকেরই চুল উঠে যায়। শরীর কাহিল হয়ে যায়। তার মা'র যেন ওরকম কিছু না হয়।

এত নামী কোম্পানির এত বড় পদ। কত লোক তার সঙ্গে কথা বলার জন্য উদগ্রীব। বহু মানুষ তাকে বিশেষ সম্ভ্রমের চোখে দেখে। এসবই সত্য। কিন্তু আর-একটা সত্যও যে রয়েছে। তার মা, স্ত্রী, ছেলে, বাবা, পরিবারের আর সকলকে বোধহয় সত্যিই আর-একটু সময় দেওয়া উচিত ছিল। এই দুর্বল মানসিক অবস্থায় তার কেবলই মায়ের কথা মনে পড়ছে।

অনুভাদেবীর ডায়েরিতে ধরা আছে কত ছোট-ছোট সহজ কথা। অতি সাধারণভাবে মনের কত গভীর কথা বলে গেছেন তিনি, যা অন্তর স্পর্শ করে। মা এক জায়গায় লিখেছেন, "মানুষ আয়নায় কেবল নিজের মুখটাই দেখে। যদি একবার সে নিজের অন্তরটা ওইভাবে দেখত, তাহলে বুঝত কত ভয়াবহ অসুখ সেখানে বাসা বেঁধে আছে। দেখত কত তুচ্ছ গোপন লালসা সেখানে, কত স্বার্থপরতা। দেখে শিউরে উঠে সে হয়তো নিজেকে শোধরাত।"

আর-এক জায়গায় অনুভা লিখেছেন, "এই পৃথিবীর রূপ রস বর্ণ গন্ধ আমার ভারী ভাল লাগে। সুকুমার অপরাধ-জগতের মানুষজন নিয়ে, আইনের প্যাঁচ-পয়জারের কথা নিয়ে ভাবে গভীর রাত পর্যন্ত। খুনির হয়েও মাঝে-মাঝে সে ওকালতি করে। আর আমি শুধু ভাবি পৃথিবী কী বিচিত্র! এর রহস্যের আদিও নেই, অন্তও নেই।"

পড়তে-পড়তে কয়েকদিন ধরে ঋষভের মনে হচ্ছে, মা বেঁচে থাকতে-থাকতে এই ডায়েরিটা ছাপিয়ে ফেললে কেমন হয়! সোমা ঠিকই বলেছে, বিভাসকে পড়তে দিলে ও লেখাটার কদর করবে। ওর জানা প্রকাশককে বলে যদি ছাপিয়ে দেয়, বেশ হয় তাহলে।

এবার মোবাইলে ঐশী। ধরবে না মনে করেও শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাটা রাখতে পারল না ঋষভ।

"হ্যালো।"


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

"স্যার, আপনি নাকি নার্সিং হোমে?"

"কে বলল?"

"একটু আগে অফিসে ফোন করেছিলাম, রাহুল বলল। কী হয়েছে স্যার?"

"কিছু হয়নি। আমি ভাল আছি। অফিসেই ফিরছি।"

"থ্যাঙ্ক গড। স্যার, যদি আপনি প্রি-অকুপায়েড না থাকেন, তাহলে আমরা একবার দেখা করতে চাই আপনার সঙ্গে। মানে, আমি আর সায়ন্তন। মার্কেটিংয়ের সায়ন্তন। চেনেন তো?"

"জানি, জানি তোমরা দু'জনে কী বলবে। তার কোনও দরকার নেই। লিভ মি অ্যালোন।"

"স্যার, খুবই জরুরি কথা। আপনাকে শুনতেই হবে।"

ফোনটা মাঝপথেই কেটে দিল ঋষভ। সুখলাল আয়না দিয়ে লক্ষ করছে। এত কৌতূহল? ওদিকে আবারও বাজছে ফোনটা।

না, আর নয়। অনেক হয়েছে। ঋষভ আর কোনও ফাঁদে পা দেবে না। কোনও মায়াজালে জড়াবে না নিজেকে। এই সেবা গ্রুপ তার সঙ্গে ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাকে সাজিয়ে তুলেছে এক খলনায়ক হিসেবে। আর নয়। নিজের হাতে তৈরি মূল্যবান নয়ডা প্রজেক্টের রিপোর্টটা সে এই অর্বাচীনদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে না। পাওয়ার প্ল্যান্টের সব খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তৈরি করা আছে ফাইলে। ওটা ঋষভ সরিয়ে ফেলবে। এবং আজই। গাড়ি থেকে নেমে লিফ্‌ট পর্যন্ত যেতে-যেতেই সে সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিল।

দিন তো একদিন আসবেই, যখন এই গদি ছেড়ে দিতেই হবে। চলে যেতে হবে এতদিনের রাজ্যপাট, এই সযত্নে গড়ে তোলা বিশাল কর্মক্ষেত্র ছেড়ে।

"রাহুল।"

"স্যার?"

"একটা পেন-ড্রাইভ দিয়ে যাও আমাকে। আর দেখো এখন কেউ যেন আমাকে ডিস্টার্ব না করে। কোনও ফোনকল দিও না আমাকে।"

"ওকে স্যার।"

রাহুল পেন-ড্রাইভ দিয়ে যেতেই ল্যাপটপটা অন করল ঋষভ। মৃদু একটা সুরধ্বনি মুহূর্তের জন্য উঠেই মিলিয়ে গেল। পাসওয়ার্ড, কি-বোর্ড, মাউস পরপর কয়েকটি স্টেপের শেষে স্ক্রিনের উপর ভেসে এল সবক'টি ফাইল। 'নয়ডা প্রজেক্ট-এ', 'রিভাইজড নয়ডা প্রজেক্ট' ইত্যাদি। ক্লিক করতেই খুলে গেল আসল ফাইলটা।

কিন্তু এ কী! ভাইরাস। সমস্ত ফাইলটা কখন কীভাবে কোরাপ্ট হয়ে গেছে। ভাঙাচোরা বিশ্রী সব বর্ণমালা। পাগলের মতো এ-পাতা ও-পাতা উপর নীচ করতে লাগল ঋষভ। কিছুই নেই প্রায়। কিছু উদ্ধার করা যায় না।

শেষ। সব শেষ। পাগলের মতো আঙুল চলতে লাগল ল্যাপটপের মাউসে। কিছু নেই। কে করল এমন সর্বনাশ!

একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল ঋষভের কণ্ঠ থেকে। আর তখনই মনে হল, একটা বর্শা যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিচ্ছে তাঁর হৃৎপিণ্ডটা।

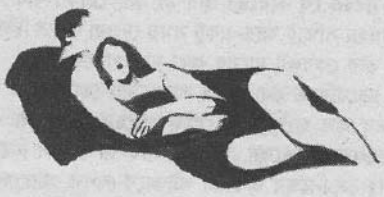

## সোনার চেয়ে দামি

যত ছোটই হোক না কেন, বিভাস এখন একটি জমির মালিক। দীর্ঘ চল্লিশ বছর এই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকূপে কী করে যে তারা কাটাল, সেটা ভাবতেই এখন ভারী অবাক লাগছে। পাইনবাবু লোকটি প্রায় জলের দরে জমিটা ছেড়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এক থোকে বায়না বাবদ ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে নিলেও, বাকি টাকাটা কিস্তিতে দেওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন।

পাবলিশার্সের দেওয়া টাকার সঙ্গে ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকা তুলে আপাতত কাজ সারা গেছে। ঋষভের দেওয়া টাকাটায় আর হাত দিতে হয়নি। ভেবেচিন্তে টাকাটা ফেরতই দিয়ে দেবে বলে দুপুরে বাড়ি থেকে বেরনোর জন্য তৈরি হচ্ছিল বিভাস, এমন সময় অলকেন্দুর ফোন এল।

"একবার আসতে পারবি আজ?"

"কখন বল তো? আমি একটু বেরোচ্ছিলাম..."

"সভাসমিতি না সংবর্ধনা?"

"ওসব কিছু নয়। অন্য একটা কাজে।"

"খুব জরুরি না হলে কাজটা আপাতত ক্যানসেল কর। চারটের সময় অ্যাকাডেমিতে চলে আয়। একটা নাটক দেখাব। একটা নয়, দুটো। একটা মঞ্চের উপর, আর-একটা দেখাব আমি প্রকাশ্য দিবালোকে।"

"তোর এই হেঁয়ালি মার্কা কথাবার্তাগুলো কবে ছাড়বি বল তো অলক?"

"হেঁয়ালি নয় মোটেই ব্রাদার। সত্যিই নাটক। আমার সেই ব্রেকিং নিউজটাই আজ শোনাব তোকে। চলে আয় প্লিজ।"

ঋষভের কাছে তাহলে অন্য আর-একদিন যাওয়া যাবে। টাকাটা তো আর খরচ করছে না সে।

দময়ন্তীর স্মৃতি ধীরে-ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে। এদিকে ভদ্রেশ্বরের জমিটা কেনার পর থেকেই রুমকি যেন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে। বিভাসের দিকে তার কী নজর! স্কুল যাওয়ার আগে ভোরে উঠে রোজ জলখাবার বানিয়ে রেখে যাচ্ছে। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে বিভাস চাওয়ার আগেই লেখার টেবিলে রেখে যাচ্ছে চায়ের কাপ। আর আশ্চর্য, লেখাটাও যেন এবার আস্তে-আস্তে এগোচ্ছে। চরিত্রগুলো ফুটে উঠছে, ঘটনা বাঁক নিচ্ছে, তৈরি হচ্ছে কবিতার মতো মনোরম গদ্য।

যেন একটা স্বপ্নের নির্মাণ শুরু হয়েছে। খুব জোরে বাতাস বইছে। সুগন্ধী ফুল ফুটছে চারধারে। বদলে যাচ্ছে চারপাশের রং। এইবার কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটবে। সব দুঃখ যন্ত্রণা অতৃপ্তির অবসান হবে। একটি প্রত্যাশার সুখানুভূতি মনটাকে কোমল করে দিয়েছে। না-ই বা ফিরে এল দময়ন্তী, তাতেও বোধহয় কিছু এসে যায় না আর।

রবীন্দ্রসদনে পৌঁছতেই একটি ফোন এল।

"বিভাসদা, আমি অর্জুন বলছি। চিনতে পারছেন তো? গত সপ্তাহে কথা হল আপনার সঙ্গে, আমেরিকায় যাওয়ার ব্যাপারে। মনে পড়ছে?"

"কেন মনে পড়বে না ভাই? তা কী ঠিক হল শেষ পর্যন্ত?"

"আপনি কনফার্ম করলেই আপনার ভিসার জন্য যা-যা কাগজপত্র লাগবে সব পাঠিয়ে দেব। আপনার সঙ্গে মিট করে প্রোগ্রামটা একেবারে ফাইনাল করে নিতে চাই। ওখানে আপনাকে আমরা অতনুদের অ্যাপার্টমেন্টে রাখব। কোনও অসুবিধে হবে না।"

"তাহলে তো খুব ভালই হয়। কিন্তু যেতে হবে কবে?"

"আগস্টের গোড়ায়।"

আরও দু'-চারটি কথাবার্তা হওয়ার পর ফোনটা বন্ধ করল বিভাস। গর্বে তার বুকটা ফুলে উঠছে। ভাবা যায়!

রাইকে লাল-নীল রঙিন পেন্সিলের একটা বাক্স কিনে দিয়েছে বিভাস। সে এখন মনের আনন্দে ছবি এঁকে-এঁকে ড্রইং খাতা ভরিয়ে তোলে।

একদিন রাই একটা খাতার পাতা বিভাসের সামনে মেলে ধরে বলে, "বাবা, এই দ্যাখো আমি আমাদের নতুন বাড়ির ছবি এঁকেছি। কেমন হয়েছে, ভাল না?"

বিভাস তাকিয়ে দেখে পাতা জুড়ে রাই এঁকেছে একটা খড়ের চাল দেওয়া কুঁড়েঘর। পাশে বড়-বড় গাছ। মাটির রাস্তা। পাখি উড়ছে নীল আকাশে।"

"এরকম বাড়িতে তোমার থাকার ইচ্ছে নাকি রাই?"

"হ্যাঁ। কেমন পাখি উড়ছে। সবুজ গাছপালা চারিদিকে।"

"এসব তুমি দেখলে কোথা থেকে?"

"আমি স্বপ্নে এরকম বাড়ি দেখি।"

স্বপ্নের উল্লেখে বিভাসের মনে পড়ে যায়, সে এখনও প্রায়ই শ্যামারানিকে স্বপ্নে দেখে। আলুথালু বেশ।

শ্যামারানি চোখ পাকিয়ে বলে, "কী দেখছিস রে অমন করে? আমি কি ভূত?"

"নয় তো কী? ভূত নয়, তুমি পেত্নি।"

"খুব কথা শিখেছিস যে। বড় হয়ে উঠেছিস দেখছি অনেক। আমাকে বালিগঞ্জে স্টেশন থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের ট্রেনে তুলে দিতে পারবি? আমি মথুরাপুর যাব। ওখানে অনেক ফলিডল পাওয়া যায়। আমি ফলিডল খেয়ে মরে যাব। আর কোনওদিন তোদের জ্বালাতে আসব না রে বিভু।"

"না মাসি, তুমি চলে যেয়ো না। তুমি চলে গেলে আমি খুব কাঁদব।"

"তুই যে খুব কাঁদবি, সে আমি ভাল করেই জানি। কিন্তু তোর মা আমাকে ওরকম করে বলল কেন?"

"কী বলল?"

"সে অনেক কথা। বড়দের সেসব কথা তোর শুনে কাজ নেই।"

হাতে এখনও কিছুটা সময় আছে। কিন্তু আর তর সইছে না। কখন আসবে অলকটা? কখন দেখাবে তার নাটক? কিছুই নয় হয়তো। ওর কথাবার্তার ধরনই ওরকম। তবে ও এলে প্রথমেই ওকে আমেরিকা যাওয়ার


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

পাকা খবরটা দিয়ে দেবে বিভাস।

এখন রুমকি, তার মা বদলে গেছে। নিজেও সে খুশি। রুমকি খুশি তার বাড়ি পেয়ে আর বিভাস খুশি লেখক হিসেবে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছে বলে। প্রতিষ্ঠা! প্রতিষ্ঠা কাকে বলে? শুধুই নাম, খ্যাতি, অর্থ? আর যিনি বসে থাকেন নির্জনে নদীতীরে, আকাশ জোড়া যাঁর চিত্রপট? তিনি কি সব প্রতিষ্ঠার ঊর্ধ্বে!

পিঠে একটা চাপড় খেয়ে বিভাসের ভাবনা মাঝপথে থেমে যায়।

বিভাস ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল অলক। আর অলকের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে একজন মহিলা।

এয়ারপোর্টে নেমে জিৎ কাউকেই দেখতে পেল না। লাগেজ ট্রলিটা ঠেলতে-ঠেলতে বাইরে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল একজন একটা প্ল্যাকার্ড ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে লেখা 'অরিজিৎ মিত্র ফ্রম লন্ডন'।

সে হেসে লোকটার দিকে একটু এগিয়ে যেতেই, একহাতে তার হাতের ব্যাগটা নিয়ে আর একহাতে স্ট্রলিব্যাগ ঠেলতে-ঠেলতে লোকটা বলল, "চলো ভাই জিৎসাব। তুমি আমায় চিনবে না। আমি হিন্দুস্তান রোডের বাড়ির ড্রাইভার মকবুল।"

"আমার বাবা-মা আসেনি?"

"না! তোমার নানির শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে তো!"

লোকটা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলছে। জিতের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাচ্ছে না কেন? কিছু কি লুকোতে চাইছে লোকটা! তার ঠাম্মা বেঁচে আছে তো!

দমদম এয়ারপোর্ট থেকে হিন্দুস্তান রোডের দূরত্ব অনেকটাই। তারপর সারা রাস্তায় জ্যাম। মকবুল মাঝে-মাঝে দু'-একটা কথা বলছে। কিন্তু লোকটাকে একটু উত্তেজিত লাগছে। বিমর্ষও। কয়েকবার হাত কেঁপে গেছে তার, অল্পের জন্য অ্যাকসিডেন্ট হয়নি।

ড্যাডকে ই-মেলে সব টাইমিংগুলো জানিয়ে দিয়েছিল জিৎ। প্লেনে ওঠার দু'দিন আগে কথাও হয়েছিল। প্লেনে ওঠার আগে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছিল সে। তখন কলকাতায় মাঝরাত, তাই জবাব আশা করেনি। তবে পরশুদিন একটা অচেনা নম্বর থেকে দু'বার কল এসেছিল। লাগেজ গোছানোর ব্যস্ততায় আর কলেজের একটা প্র্যাকটিক্যাল নোটবুক জমা দিয়ে আসার তাড়াহুড়োয় কলব্যাক করে জেনে নেওয়া হয়নি। মনে হয় ঠাম্মাকে নিয়ে সকলেই খুব ব্যস্ত। পিসিরা থাকে পেনসিলভানিয়ায়। দিন চারেক আগে ওদের সঙ্গে যখন কথা হয়, তখনও পিসি বা পিসে কেউই ঠাম্মার শরীর খারাপের কথা বলল না তো। বোধহয় তারপর হঠাৎ..."

"ঠাম্মা কেমন আছে এখন? বেঁচে আছে তো?"

আর-একবার জোরে ব্রেক কষল মকবুল।

জিৎ চিৎকার করে উঠল, "কী হচ্ছে কী! সাবধানে চালাও।"

বাকি রাস্তাটা খুবই সন্তর্পণে নীরবে গাড়ি চালিয়ে গেল মকবুল।

তবে তার গন্তব্যস্থল হিন্দুস্তান রোডের 'মিত্র ভবন' নয়, লাউডন স্ট্রিটের এক নার্সিং হোম।

তখন সকালবেলার সূর্য প্রচণ্ড আলো আর উত্তাপ ঢেলে দিচ্ছে কলকাতার কর্মব্যস্ত জনবহুল রাজপথে। অর্থের জন্য, ধান্দার জন্য, সুযোগের জন্য আশায় ও হতাশায় বেরিয়ে পড়েছে কত মানুষ। ফুটপাথে আর যানবাহনে শুধু ভিড় আর ভিড়। চারিদিকে কোলাহল আর শব্দ। তবু সে-সবের কিছুই আর কানে পৌঁছচ্ছে না কর্মচঞ্চল ঋষভ মিত্রের কানে। নার্সিং হোমের বিছানায় সাদা চাদরে ঢাকা তার শরীরটা এখন নিস্পন্দ। ভোরবেলা চারটের সময় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে মারা গিয়েছে ঋষভ।

সেই দময়ন্তী! ওর পাশে অলক। দু'জনের মুখেই মৃদু হাসি।

এটা কী করে সম্ভব? বিভাস তাকিয়ে থাকে নির্বাক।

অলক বলল, "ভ্যাবলার মতো শুধু তাকিয়ে থাকবি নাকি ওখানটায় বসবি। কৌতূহলে তোর চোখমুখ যা দেখাচ্ছে না! আয় আমাদের সঙ্গে।"

যন্ত্রচালিতের মতো বিভাস হাঁটতে লাগল ওদের সঙ্গে। দময়ন্তী কোনও কথা বলছে না। তাকাচ্ছেও না ওর দিকে একবারও। শুধু অবিরাম কথা বলে চলেছে একা অলক। দময়ন্তী একটা নকশাদার কাঁথাস্টিচের শাড়ি পরেছে। কানে গলায় হাতে গয়না। এরকম সাজে আগে কখনও ওকে দেখেনি বিভাস।

"এই তোরা দু'জনে এমন ভাব করে আছিস যেন আগে কখনও কোথাও মিট করিসনি।"

বিভাসের ইচ্ছে করল হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেয়। রাগে ঘৃণায় তার শরীর কাঁপছে। এ কোন পরিস্থিতির মধ্যে তাকে এনে ফেলল অলক? পাগলামির একটা সীমা থাকে। নাটকের সত্যি আর বাকি কী আছে!

দময়ন্তী হঠাৎ বিভাসের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, "এবার পুজোয় কোথায় লিখছেন?"

"দেখি," সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় বিভাস। হিপোক্রিসির একটা সীমা আছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে অলক বলে, "গড়িয়াহাটে গিয়েছিলাম। বিয়ের বেনারসি দেখতে। আগেরবার তো ঘটাপটা কিছুই হয়নি। তোর মনে আছে সে কথা নিশ্চয়ই। আর এবারে আমাদের তো অঢেল হয়েছেই, প্রণামির শাড়িই হয়েছে একুশটা...," আরও অনেক কথা বলছিল অলক, কিন্তু সেসব কিছুই কানে ঢুকছিল না বিভাসের।

"মাসখানেক আগেও দময়ন্তীর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না, বুঝলি। বাবা আর মা গিয়েছিলেন বেড়াতে নাগপুর, আমার ছোটমামার কাছে। সেখান থেকে আবার সকলে মিলে ছোটমামির বাপের বাড়ি বিলাসপুরে। সেখানেই হঠাৎ দেখা হয়ে যায় ওর সঙ্গে। বাবা মা'র কান্না দেখে ও নিজেকে আর শেষ পর্যন্ত...তারপর বাবা মা'র কাছে সব শুনে আমিও...! প্রথম প্রেম যে কীভাবে ফিরে আসে, এটা তার একটা ক্ল্যাসিক একজাম্পল।"

"তুমি একটু থামবে? নাটক শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই কিন্তু।"

বিভাসের মনে হল শুরু কোথায়, নাটক তো শেষ হয়েই গেল এখানে। তবু দেখতেই হ'ল নাটক। মাঝখানে দময়ন্তী। দময়ন্তী কি অলককে তাদের এতদিনের গোপন মেলামেশার কথাটা বলে দেয়নি? নিশ্চয়ই না। অলক রেখেঢেকে কথা বলে না। জানলে নিশ্চয়ই হাসি-তামাসায় প্রসঙ্গটা তুলে ফেলত। বিভাস তাই কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে।

দময়ন্তীই বা হঠাৎ এত মহীয়সী নারী হয়ে উঠল কেন? শুধু অলকের বাবা মা'র কথা ভেবে সে তার স্বাধীনতা ইচ্ছে-অনিচ্ছে, তার গোপন ভালবাসা, তার অভ্যাস সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে দিল এক কথায়? বিভাসের মনে পড়ল, দময়ন্তীর বিলাসপুরের বেডরুমে দেখা সেই ঘুমের ওষুধের শিশিটার কথা। দময়ন্তী অসুখী ছিল এতদিন। কিন্তু সে কার জন্য? এখন মনে হচ্ছে, সে আসলে ছিল অলকেরই প্রেমিক। অলককে হারিয়ে সে হয়তো বিভাসের মধ্যে খুঁজে নিতে চেয়েছিল অলকের অস্তিত্ব।

সব কিছু অসহ্য মনে হচ্ছে বিভাসের। ইচ্ছে করছে চিৎকার করতে, ভেঙে ফেলতে চারপাশ। কিন্তু সে পারল না। সব মানুষ পারেও না সময়মতো বিদ্রোহ করতে। উল্টে দিতে পারে না সাজানো সংসার, পাতানো সম্পর্ক, ভদ্রতার মুখোশ। দু'ঘণ্টা ধরে নাটকের একটা দৃশ্যও মন দিয়ে দেখেনি বিভাস। হল থেকে বেরিয়েও একটা কথা বলেনি দময়ন্তীর সঙ্গে।

বাড়ি ফিরে এসে খুব স্বাভাবিকভাবে খাওয়াদাওয়া করল বিভাস। তারপর খানিক রাত পর্যন্ত লিখে, একসময় বিছানায় উঠে রুমকিকে টেনে নিল দুই বাহুর মধ্যে। যতটা ঘৃণা করতে চাইছে দময়ন্তীকে, ততটাই যেন ভাল লাগছে আজ রুমকিকে। অনেক শরীরী আদরের শেষে ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল দু'জনেই।

অনেক রাতে আজ আবার শ্যামারানি এল স্বপ্নের মধ্যে। তার গায়ের বসন প্রায় খুলে পড়েছে। আর তার সর্বাঙ্গ নীল হয়ে আছে বিষের প্রকোপে।

একটা কাচঢাকা শববাহী গাড়িতে ঋষভের দেহ নিয়ে আসা হয়েছে নার্সিং হোম থেকে 'মিত্র ভবন'-এ। আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী মানুষের ভিড়ে বাড়ি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে।

দোতলায় নিজের ঘরে সুকুমার মিত্র পাথরের মতো বসে আছেন তাঁর ইজি-চেয়ারটিতে। মুখে কোনও কথা নেই, কোনও অভিব্যক্তি নেই। চোখ দু'টিও মরুভূমির মতো একেবারে শুকনো। ঘরে আর যাঁরা প্রবীণ লোকজন বসে আছেন, তাঁরা সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষাটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন।

সকাল থেকে সোমা তার শাশুড়ি মায়ের পায়ের কাছে বসে আছে। অনেক কেঁদেছে সে আজ সকাল থেকে। সে কান্না কি এই মানুষটিকে চিরতরে হারানোর শোকে, নাকি জিতের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে? বেঁচে থাকতে ঋষভকে সে মন থেকে কখনও ভালবাসেনি। এই বোধটাও আজ তাকে ভয়ানক পীড়া দিচ্ছে।

নার্সিং হোম থেকে হিন্দুস্তান রোড পর্যন্ত আসতে-আসতে জিৎ মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করছিল, সে বাড়ির কারও সঙ্গে কোনও কথা বলবে না। মা নয়, ঠাম্মা নয়, দাদু নয়, কারও সঙ্গেই নয়। তার খালি মনে হচ্ছে, বাবাকে বাঁচিয়ে রাখতে এরা কেউ তেমন চেষ্টা করেনি। সে যদি দু'দিন আগেও জানতে পারত, তবে ড্যাডকে এভাবে চলে যেতে দিত না। প্রবল অভিমানে তার বুকটা ফুলে-ফুলে উঠছে। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে চারপাশের দৃশ্য।

কত আশা নিয়ে, কত প্ল্যান করে সে এবার কলকাতায় এসেছিল। ইচ্ছে ছিল সকলে মিলে কত আনন্দ করবে। সব যে এভাবে বানচাল হয়ে যাবে, সে কল্পনাও করেনি। রাগে ক্ষোভে হতাশায় অভিমানে সে দাঁতে-দাঁত চেপে বসে আছে। বারবার হাতের তেলোয় মুছে নিচ্ছে চোখের জলের ধারা।


Stumpy Present

Be familiar with www.banglatorrents.com

সকলেই আশঙ্কা করছিল, ঋষভের মৃত্যুর খবর পেয়ে অনুভাদেবীর শরীরটা বেশি খারাপ হয়ে পড়বে। একজন ডাক্তার ও একজন নার্স ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছেন। মৃতদেহ স্ট্রেচারে করে এনে রাখা হল অনুভাদেবীর শয্যার পাশে মেঝের উপর।

নার্স মেয়েটি অনুভাকে ধরে-ধরে নিয়ে গিয়ে বসাল ঋষভের পাশে। কী আশ্চর্য, তিনি ভেঙে পড়লেন না। চিৎকার করে কেঁদেও উঠলেন না। শুধু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ছেলের কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "সেই তো চলে গেলি বাবা, আর দুটো দিন তর সইল না! আমি তো যেতামই। তারপর না হয়...," আর বলতে পারলেন না। ছেলের মাথায় গভীর স্নেহে হাত বোলাতে-বোলাতে অকস্মাৎ তিনি জ্ঞান হারালেন। ঘরের মধ্যে ছুটে এলেন ডাক্তার। কান্নার রোল উঠল বাড়িতে।

'মিত্র ভবন' থেকে একসময় শববাহী গাড়িটি যাত্রা করল আবার। কলকাতার দৈনন্দিন ব্যস্ত ট্র্যাফিক, অফিসমুখী লোকজন সব ছাড়িয়ে অবশেষে গাড়ি এসে পৌঁছল ক্যামাক স্ট্রিটে সেবা গ্রুপের অফিসে। সেখানে ফুল মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে সকলে। কাশীনাথ, নাগরাজন, অতীশ, রাজা দাশগুপ্ত এবং অফিসের প্রায় সকলেই।

প্রথমেই এগিয়ে এলেন চেয়ারম্যান সাহেব। ঋষভের বুকের উপর শ্বেতপদ্মের বড় একখানি মালা শুইয়ে দিতে দু'-একজন তাকে সাহায্য করল। কর্পোরেট হাউসের দুঁদে লোকজন পাবলিকের সামনে কাঁদে না। তবু কারও চোখ এড়াল না যে, বৃদ্ধ রায় সাহেবের চোখ দু'টিও আজ ছলছল করছে।

এর মধ্যেই খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। অফিস চত্বরে হাজির হয়ে গিয়েছে মিডিয়ার লোকজন। কয়েকজন সাংবাদিক অরবিন্দ রায়কে কিছু বলতে বলছে। শোকের মুহূর্তেও নিজেকে কীভাবে সামলে নিতে হয়, তিনি তা ভালভাবেই জানেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনিও কিছু বলতে পারলেন না। ক্যামেরা আর মাউথপিস হাতে মিডিয়ার লোকেরা তাঁর পিছনে-পিছনে গাড়ি পর্যন্ত দৌড়ে গেল। কিন্তু তিনি মুখ খুললেন না।

খবর পেয়ে এসেছেন নারায়ণ দত্ত রায়। আজ তাঁর মুখ থমথমে। পাশে দাঁড়ানো তাঁর পরিচিত একজনকে বললেন, "আ ট্র্যাজিক এন্ড অফ আ হিরো। বুঝলে, ঋষভকে আমি একজন হিরো ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। এরকম ডেডিকেটেড কেউ হয়ই না। তবে ইদানীং বড় টেনশনে ছিল, সেটা বুঝতে পারতাম।"

সুখলাল দু'রাত ঘুমোয়নি। যেদিন থেকে সাহেব নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছে, সেদিন থেকে তার দু'চোখের ঘুম উড়ে গেছে। কেন সে তা বুঝতে পারছে না, কিন্তু তার খালি মনে হচ্ছে, সাহেবের এই রকম হওয়ার জন্য সে-ই দায়ী। সে ঐশী ম্যাডামকে নিয়ে সাহেবের বেড়ানোর গল্পটা চেপে রাখতে পারেনি। কিন্তু সাহেবের শরীর যে ধীরে-ধীরে খারাপ হচ্ছে, এটা আন্দাজ করেও সে কেন কাউকে কিছু বলেনি? ভিড় থেকে পালিয়ে গ্যারাজে বসে সকলের অলক্ষ্যে ডুকরে কেঁদে ওঠে সুখলাল।

ওদিকে একফাঁকে কাশীনাথ রাজা দাশগুপ্তকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, "শ্মশান থেকে আবার সোজা বাড়ি চলে যাবেন না। বারোতলা থেকে জরুরি কাগজপত্রগুলো সব আজই আমার অফিসের ক্যাবিনেটে সরিয়ে ফেলতে হবে, কথাটা মনে থাকে যেন।"

এই ভিড়ে এই শোকের মিছিলে সকলেই আছে। নেই শুধু দু'জন। ঐশী আর সায়ন্তন। শ্মশানের এককোণে ওরা দু'জন পাশাপাশি চুপচাপ বসে আছে। কেউ কথা বলছে না, কাঁদছেও না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার আবসানে বুক চিরে কান্নাটা যে কখন উঠে আসবে, এই প্রতীক্ষায় ওরা ভাষাহীন নীরব।

বিভাস সংবাদটা পেল পরের দিন সকালে। কাগজের তৃতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে খবরটা। কর্পোরেট জগতের নক্ষত্র ঋষভ মিত্রের জীবনাবসান। বুকটা ধক করে উঠল বিভাসের। এই 'জীবনাবসান' শব্দটা যে ঋষভের নামের পাশে কী ভীষণ বেমানান! মন কিছুতেই মানতে চাইছে না। কী এমন হল হঠাৎ? বিভাস বুঝতে পারল, এ ঠিক স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। এইরকম একজন অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর সপ্রতিভ মানুষের জীবন এমন আকস্মিকভাবে থেমে যেতে পারে না কখনও।

বিভাসের মনটা এমনিতেই আজ মুষড়ে আছে। কাল স্বপ্নের মধ্যে আবার এসেছিল শ্যামারানি। বারবার মনে হচ্ছিল সে কিছু বলতে চায়।

"কী হয়েছে ছোটমাসি, অমন করছ কেন তুমি?"

সে হঠাৎ বলতে থাকে, "দাদাবাবু বেঁচে থাকলে আমার এমন হত না রে বিভু। আমি জানি যা ঘটেছিল তাতে দাদাবাবুরও সবটা দোষ ছিল না। দিদি বড় সন্দেহ করত যে, আমার সেটা ভাল লাগত না একদম।"

"কেন বাবা কী করেছিল?"

"সে সব তোর শুনে কাজ নেই বিভু। সব আমার দোষ, আমি যে পারিনি নিজেকে আটকাতে। আমি যে ওঁকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছিলাম। মেয়েমানুষ আমরা।...বলেছিলাম দিদিকে, না লুকিয়ে সব একদিন বলেই দিয়েছিলাম। আর না বলে যে আমার উপায়ও ছিল না। আমার শরীরে তখন সব চিহ্ন ফুটে ফঠেছে। দিদির চোখ আমি এড়াই কী করে? কিন্তু..."

"আর বলো না, বোলো না মাসি। সংসারে যা-যা ঘটে তার পিছনে লুকিয়ে থাকে অনেক অনিয়ম, অনেক অতৃপ্তি। কীভাবে বিচার করি বলো কোনটা পাপ আর কোনটা অন্যায়।"

বিভাসের স্বপ্নের মধ্যেই শ্যামারানী কখন ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে চলে যায় অচিন দেশে।

ঘুম থেকে ওঠার পরও শ্যামারানির কথা মনে পড়ে। সব কথা। একটা গোপন সত্য উঁকি দিয়ে যায় মনের মধ্যে। বাবাকে তো তেমন মনে পড়ে না, খুব আবছা মনে হয় বাবার সব স্মৃতি। তবু শ্যামারানির প্রলোভনে একদিন যে ধরা দিয়েছিল, সেই দুর্বল রক্তমাংসের মানুষটাকে তার লেখক মন আজ বাবা বলে মেনে নিতে অতটা ঘৃণা বোধ করছে না।

এই অনিশ্চিত জীবনে মানুষ কত রকম প্রত্যাশা করে। গতকাল সন্ধের দিকে ছানা তালুকদার বিভাসকে ফোনে খবর দিল যে, রয়্যালটি বাবদ বিভাস নাকি আরও হাজার সাতেক টাকা পাবে। দু'-একদিনের মধ্যে এসে টাকাটা নিয়ে গেলে ভাল হয়। কারণ সে দেশে যাবে। রুমকির জন্য শাড়ি কিনে রেখেছে সে। স্ত্রীর হাসিমুখটুকু দেখার আগ্রহেই সে খুশি।

আজ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে সকাল থেকে। এই বৃষ্টিতে রাই আজ স্কুলে যাবে না, রুমকিরও আজ হঠাৎ-ছুটি। মা উমারানি খিচুড়ির ব্যবস্থা করছেন, রাই খাটের উপর বসে খাতা জুড়ে আঁকছে বৃষ্টির ছবি। কালো ছাতা মাথায় বৃষ্টি-ভেজা মানুষজন।

ঋষভের টাকাগুলো শেষ পর্যন্ত পড়েই রইল বিভাসের কাছে। দেওয়া হল না। এগুলো নিয়ে কী করবে বিভাস? বাড়ি বানাতে অনেক খরচ হয়, একদিন হয়তো টাকায় টান পড়বেই। তখনও কি বিভাস পারবে নিজেকে সংযত রাখতে?

ঋষভের মৃত্যু আর শ্যামারানির স্বপ্ন যে-মোচড় দিয়ে গেছে বুকটায়, সেটা না হয় গোপনই থাক। আজ সকলে মিলে বৃষ্টির দিনটাকে উপভোগ করতে চাইছে। চাতকের মতো শুষে নিতে চাইছে এই বায়ু থেকে এই তাপ থেকে এই আকাশ মাটি আর অনন্ত জলধারা থেকে দুর্লভ একটুখানি সুখ। যার আর এক নাম ভালবাসা।